Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

প্যারাময় লাইফের প্যারাসিটামল

ঝংকার মাহবুব

www.PoragEdu.blogspot.com
www.PhysicsKill.blogspot.com

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

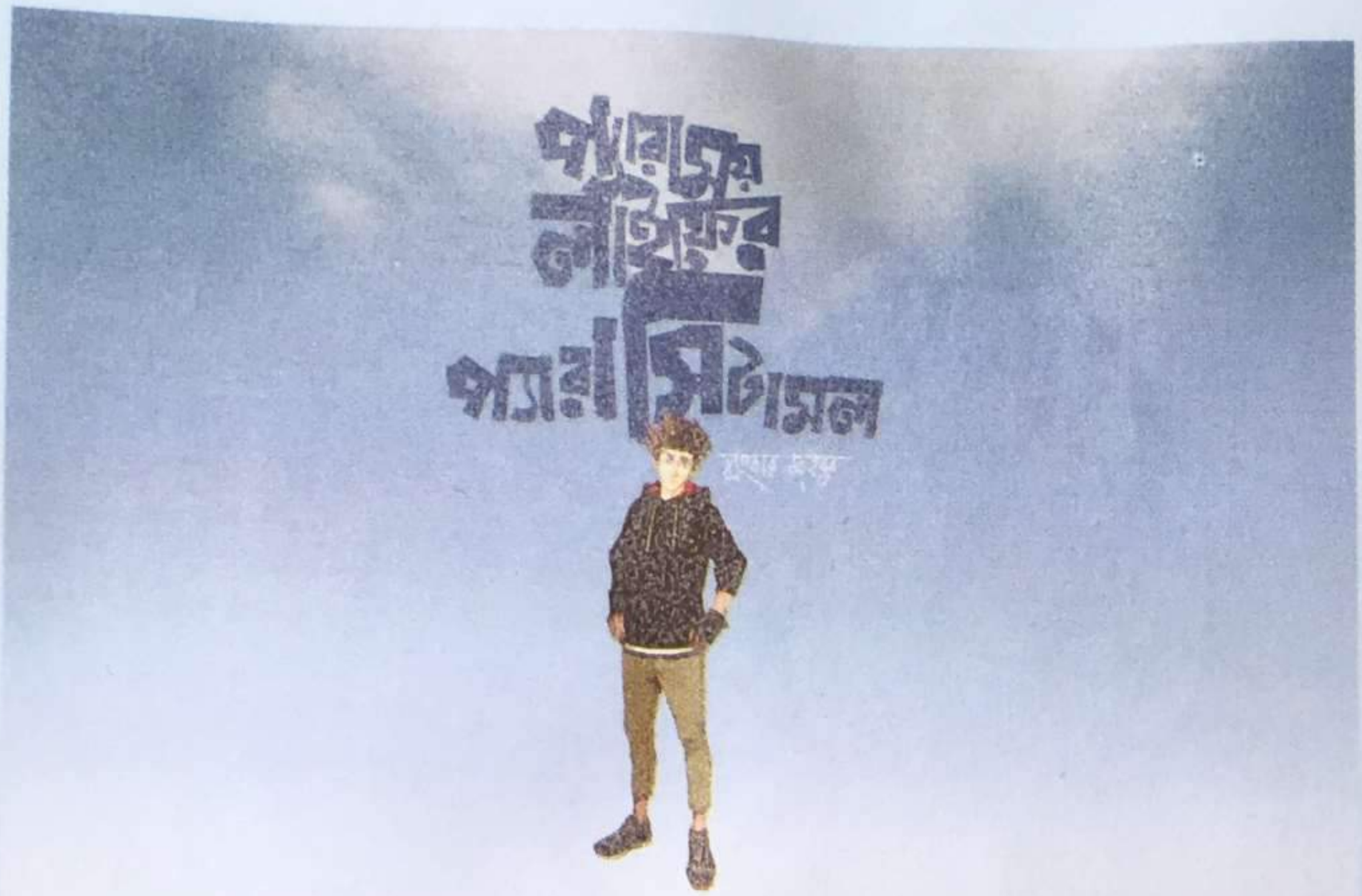

আমাদের তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ জীবনের একটা পর্যায়ে এসে হতাশ হয়ে পড়ে। কী করা উচিত, কীভাবে করা উচিত, সেটা নিয়ে তারা বিভ্রান্ত অবস্থায় থাকে। হতাশা থেকে জন্ম নেয় অনীহা, অনীহা থেকে ব্যর্থতা, আর ব্যর্থতা থেকে আবার হতাশা—এই ব্যর্থতার দুষ্টচক্রে আবর্তিত মানুষগুলোর বৃত্তকে ভাঙার জন্য নিরলস চেষ্টা করে চলেছেন ঝংকার মাহবুব। তার প্যারাময় লাইফের প্যারাসিটামল এমন আরেকটি প্রয়াস।

পুরো বইয়ে লেখক যেন তার কথা খুব কাছের কোনো ছোট ভাই বা বোনকে বলছেন। বইয়ে পাঠকের প্রতি সম্বোধনটাই বেশ চমকপ্রদ—একেবারেই কথ্য ভাষায়। দারুণ সব টুলস রয়েছে বইটিতে, যেগুলো নিজেকে যাচাই করার জন্য দারুণ সহায়ক হবে। অ্যাটেনশন চুরি হয়ে যাচ্ছে কি না সেই মিটার, সারা দিন কীভাবে কাটানো উচিত তার ঘণ্টাওয়ারি নকশা, জীবন, জীবনের যাচাইয়ে সূর্য আর মেঘের হিসাব, জীবনটা গঠনমূলক কাজে ব্যয় হচ্ছে নাকি হারিয়ে যাচ্ছে, তার হিসাব—এগুলো পাঠকের সঙ্গে বইটিকে আরও গভীরভাবে যুক্ত করে।

পৃষ্ঠাসংখ্যা দিয়ে এই বইয়ের বিস্তৃতি বোঝা যায় না। বইটি বহু তরুণকে অনুপ্রাণিত করুক, সেই শুভকামনা রইল।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

প্যারাময় লাইফের প্যারাসিটামল

ঝংকার মাহবুব

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

প্রকাশক : আদর্শ
প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : আদর্শ বই
৩৮ পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০
(+০২-৯৬১২৮৭৭, ০১৭৯৩২৯৬২০২, ০১৭১০৭৭৯০৫০
info@adarshapublications.com
www.adarshapublications.com

প্যারাময় লাইফের প্যারাসিটামল

১ম প্রকাশ : ১৯ মাঘ ১৪২৫; ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

© ঝংকার মাহবুব
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; লেখক, প্রকাশক ও অনুবাদকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত
বইটি বা বইটির অংশবিশেষ যেকোনো মাধ্যমে প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

প্রচ্ছদ : সাজু
মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা : আদর্শ প্রিন্টার্স
আদর্শর বই অনলাইনে কেনার লিংক : www.rokomari.com/adarsha

মূল্য : বাংলাদেশে ২৪০ টাকা

Peramoy Life er Peracitamol (Published in Bengali)
by *Jhankar Mahbub*
Published by Adarsha
Sales Center: Adarsha Boi

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

উৎসর্গ

—পরিবারের দো-মুখী সাপ।

—আমার বড় বোন, রিটা আপুকে।

—যিনি পড়ায় ফাঁকিবাজি করলেই কানের পেছনের ছোট চুলগুলো চিমটি দিয়ে টেনে ধরতেন। আবার অন্যদিকে আম্মু বেডঝাড়ু হাতে শাসন করতে এলে, আম্মুকে ম্যানেজ করে শাস্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিতেন।

If you want to shine like a sun, first burn like a sun.— A. P. J. Abdul Kalam

Poragedu.blogspot.com - Physicskill.blogspot.com

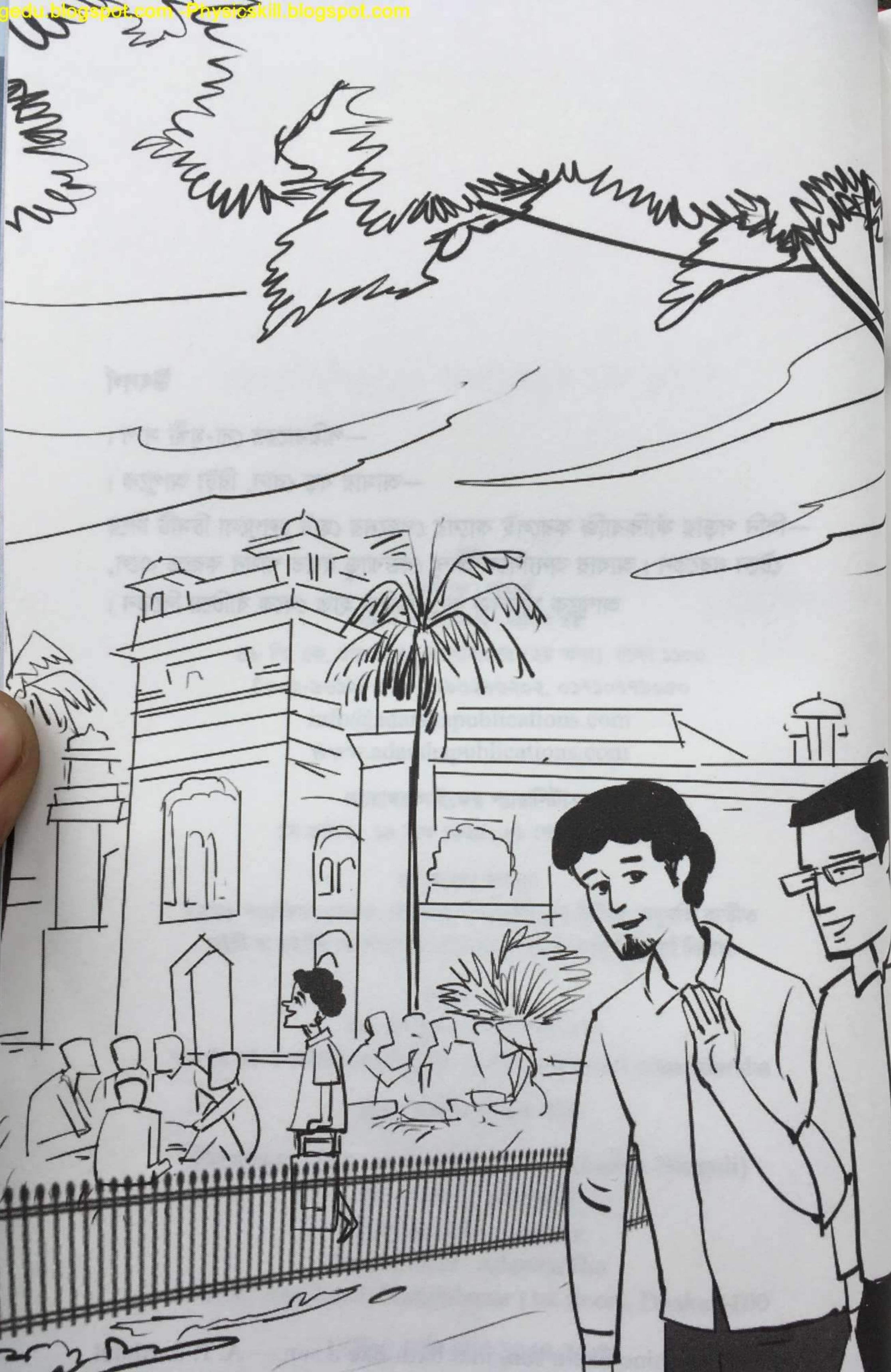

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

প্যারাময় লাইফের প্যারাসিটামল

ভুল করে কেউ এভারেস্ট জয় করে না
সময় ড্রেনে ফেললে, টার্গেট এচিভ হয় না
লাইফ করলে অডিট, বাড়বে ক্রেডিট
পুঁচকা টার্গেট দেবে, প্রেস্টিজিয়াস গিফট ১১, ১৩, ১৫, ১৮

না থাকলে ফোকাস, কপাল হবে ফাটা বাঁশ
অ্যাটেনশন হইলে ফাঁস, রেজাল্ট হবে জিন্দা লাশ
অনিয়ন্ত্রিত মোবাইল, লাইফ ধ্বংস করার হস্তী
ক্যালকুলেটেড মাস্তি, ফিউচারের স্বস্তি ২১, ২৩, ২৬, ২৯

মাইক্রোশিফট করলে, লাইফ হয় না গুবলেট
পড়া নিয়ে খেলা করে, নাকের ডগার হেলমেট
ইফেক্টিভ লাইফস্টাইলকে, মন্ত্রী বলে যক্ষ্মা
পাস দাও মা ভিক্ষা, তিন মাস পর পরীক্ষা ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৪০

অপরিচিতদের সঙ্গে কথা না বলার ধানাইপানাই
ইন্ট্রোভার্ট হয়েই, চামে কোপ মারে, রাম কানাই
আম ছাড়া আচার, প্যাশন ছাড়া ফিউচার
লিডার হলেই পয়দা হবে, চিকন পিনের চার্জার ৪৮, ৫১, ৫৩, ৫৭

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

ভয়ের সঙ্গে পাঙ্গা, ফিউচার হবে চাঙ্গা
প্রেমে স্বৈরাচারী করে, পালিয়ে বাঁচে লাফাঙ্গা
জেদ করে, খারাপ সময় ভেদ করার ফুডানি
কমপ্লিট গাইডলাইন গিলে, দেখাও তোমার মাস্তানি ৬১, ৬৪, ৬৭, ৭১

মাইক্রো লেভেলে হেরে মোরা, মেগা লেভেলে বুঝি
পড়া মনে না থাকলেও, ক্লাশের চিজটারে খুঁজি
বেশি নম্বরের সিক্রেট ঠেকায়, ডান্ডি খাওয়ার ভোজ
ইংরেজি শেখার মাইক্রোডোজে, অস্থির পোজ ৭৮, ৮০, ৮৫, ৮৭

না হয়ে দিগ্‌ভ্রান্ত, ৩ সেকেন্ডে সিদ্ধান্ত
কোথাও চান্স পাইনি, হাতে হারিকেন ছাড়িনি
চাকরির মায়েরে বাপ, স্টুডেন্ট লাইফে স্টার্টআপ
টাইম ম্যানেজমেন্টের সার্জারিতে, লাগবে না চেকআপ ৯৩, ৯৭, ৯৯, ১০২

অল্প অল্প ডিপোজিট, মাস শেষে ভালো হ্যাবিট
প্রোকাস্টিনেশনকে ফ্রাই করে, ডেস্টিনেশনের সার্কিট
হায়ার স্টাডির ভিটামিন, পার্ট নেওয়ার প্রোটিন
ফিউজ লাইফে ভোল্টেজ লাগায়, মিস্টার মুড়ির টিন ১০৭, ১১০, ১১২, ১১৬

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

করলে নিরাময়, লাইফ হবে না প্যারাময়

স্যারদের ঝাড়ি, বেডঝাড়ুর বাড়ি, বাবার চোখ রাঙানি থাকে না বলেই আমাদের কলেজ-ভার্সিটির লাইফগুলো হয়ে ওঠে দড়ি ছাড়া গরু, রাস্তা ছাড়া গাড়ি, আর চিনি ছাড়া শরবতের মতো। সেই শরবতকে আরও তিক্ত করে ইয়াম্মি করলার জুস বানিয়ে ফেলে চারপাশের দুষ্টু প্যারাগুলো। এই প্যারাগুলো সহজলভ্য হলেও সস্তা না; বরং প্যারার সংখ্যা বস্তা বস্তা।

যার মধ্যে আছে ফিউচারে কী হব, সেটা বুঝতে না পারার প্যারা, নিজের চেয়ে কম কোয়ালিটির পোলাপান থেকে পিছিয়ে পড়ার প্যারা, অপরিচিতদের সঙ্গে কথা বলতে না পারার প্যারা। তা ছাড়া পড়া মনে না থাকা, পড়তে ইচ্ছে না করা, কিংবা পরীক্ষা চলে আসার টেনশন শুরু হলে তো প্যারা ট্রাক ভাড়া করে নিজ দায়িত্বে চলে আসে। আর এত এত সব প্যারার বস প্যারা হচ্ছে—সবই বুঝি, কীভাবে করতে হবে সেটাও জানি। তারপরও শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে না পারার প্যারা। এ রকম প্রায় ২৫টা প্যারা নিরাময় করার ইফেক্টিভ টেকনিক নিয়েই এই বই—প্যারাময় লাইফের প্যারাসিটামল।

প্যারা নিরাময়ের টেকনিকগুলো একটু বেশি আন্তরিক আর ইনফরমালভাবে তুলে ধরার জন্য বইয়ে তুই বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ আন্তরিকতা বুঝতে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্যার বা মহাশয় বলে সম্বোধন না করে, তিনি বলেছেন, 'তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে, শোন আসমানী তাগিদ।'

প্যারা নিরাময় নিয়ে বই লেখার জন্য আমাকে নিয়মিত প্যারা দিয়েছেন আমার আব্বু, আম্মু, বড় বোন রিটা, নিপুণ, নূপুর আর ছোট ভাই হীরা। আর বইয়ের টেকনিকগুলো চেক করে ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য আমি প্যারা দিয়েছি আমার স্ত্রী কারিনাকে। বইয়ের প্রাথমিক ড্রাফট রিভিউ করে দেওয়ার জন্য প্যারা দিয়েছি ফজলে দায়ীন, তানভীর হাসান সিয়াম, হাসিবুল হাসান শান্ত, শাহানুজ্জামান পাপ্পু, তাহমিদুল ইসলাম, আবিদুল ইসলাম আলভী, ঋষিকেশ দাশগুপ্ত, কাজী মাসরি, শফিউল আলম শুভ, ওয়াসিমা নূর ইকরা, সারাফাত রাজ, জুনায়েদ হাসান, আসিফ উর রহমান, মাশরুফ, চমক হাসানসহ এমন অনেককে। শেষমেশ কভার আর ইলাস্ট্রেশন করতে প্যারা দিয়েছি সাজু ভাই, আজাদ আর বন্ধু রাজীবকে।

প্যারা হলে নিরাময়, বড় লক্ষ্য হবে জয়। সেই প্রত্যাশায়—

ঝংকার মাহবুব

JhankarMahbub.com

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

তবে শুরু হোক জীবনের নতুন অধ্যায়...

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

ভুল করে কেউ এভারেস্ট জয় করে না

— কিরে লুজ, তুই এইখানে কী করস?

(নিজের ব্যঙ্গাত্মক নাম শুনে মাথা তুলে তাকায় নুয়াজ। দেখে সোহান ভাই। অন্য কেউ হলে বিশাল একটা ঝাড়ি মারত। কিন্তু সোহান ভাইকে কিছু বলা যায় না। সোহান ভাই, ওনার ব্যাচের থার্ড আবার ডিপার্টমেন্টের ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন। তাই নিজেকে সামলে নিয়ে নরম সুরে বলল।)

— ভাই, আমার নাম কিন্তু, 'লুজ' না। আমার নাম 'নুজ'ও না। বাপ-মা আমার নাম রাখছে নুয়াজ।

— সে যা-ই হোক, চল ক্যাফের দিকে যাই। একটা মিটিং আছে।

— না ভাই। আজকে থাক। খুবই প্যারার মধ্যে আছি।

— কিসের প্যারা? লুজের কি লুজ মোশন শুরু হইছে?

— কী যে বলেন ভাই! ভাবছিলাম এইবার রেজাল্টাটা ভালো করে ফেলব। পরীক্ষার আগে তিন সপ্তাহ ধুমাইয়া পড়লাম। কিন্তু যেই লাউ সেই কদু।

— ও এই কথা। কালকের রেজাল্ট তুই আজকেও ভুলতে পারস নাই। এই বলে নুয়াজের পাশে বসতে বসতে সোহান ভাই বলতে শুরু করল, শুন—

ভুল করে কেউ এভারেস্ট জয় করে ফেলে না। আন্দাজে দাগায় কেউ বিসিএসে টিকে যায় না। হুট করে কেউ হার্ভার্ড-এমআইটির স্কলারশিপ পেয়ে যায় না। দুই-তিন সপ্তাহ পড়ে কেউ ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে যাবে না। কারণ প্রেস্টিজিয়াস কোনো কিছুই সহজ না। সহজ কোনো কিছুই প্রেস্টিজিয়াস না।

সে জন্যই লাইফটাকে সিরিয়াসলি চেইঞ্জ করতে চাইলে, লাইফের একটা সময়, প্রেস্টিজিয়াস একটা গোল সেট করে পাগলা কুত্তার মতো খাটতে হবে। সবকিছু থেকে নিজেকে ডিসকানেক্ট করে বন্ধ ঘরে সাধনা চালাতে হবে। হিট মুভি, হট নিউজ, ফাটাফাটি খেলা, কাটাকাটি ভাইরাল, এগুলো এক একটা ডিস্ট্রাকশন। টার্গেট এচিভ না হওয়া পর্যন্ত এগুলোকে ইগনোর করতে হবে। লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে একরোখা হতে হবে। ক্রেজি লেভেলের হার্ডওয়ার্ক করতে হবে। এক দিন, দুই দিন করে করে সপ্তাহের পর সপ্তাহ; মাসের পর মাস লেগে থাকলে একটু একটু করে চেইঞ্জ হতে শুরু হবে।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

কারণ এক রাতে বীজ থেকে গাছ হয়ে ফল দেবে না। এক রাতে কেউ বিগিনার লেভেল থেকে এক্সপার্ট হয়ে যাবে না। যে সফটওয়্যার, যে ওয়েবসাইট, যে বন্ধু, যে আড্ডা তোকে তোর টার্গেটে এগিয়ে যাওয়ার জন্য হেল্প করছে না। তার সঙ্গে এক ঘণ্টা সময় কাটানোর মানে, টার্গেট থেকে ১০ ঘণ্টা পিছিয়ে যাওয়া।

সে জন্যই লাইফের একটা সময়, প্রতিটা ঘণ্টা, প্রতিটা মুহূর্তের জন্য খুঁতখুঁতে হতে হবে। সিলেক্টিভ হতে হবে। প্রতিটা ঘণ্টা, প্রতিটা পদক্ষেপ তামা তামা বানায় ফেলবি। দরকার হলে অল্প কিছুদিন নিজের জন্য স্বার্থবাদী হয়ে লাইফের পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম বাড়ায় নিবি। অন্যের খুশির চাইতে নিজের ফিউচারকে বেশি প্রায়োরিটি দিবি।

তাহলেই ছয় মাস, এক বছর, দুই বছর পর স্পেশাল কেউ হতে পারবি। প্রেস্টিজিয়াস কিছু করতে পারবি।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

সময় ড্রেনে ফেললে, টার্গেট এচিভ হয় না

ভাই, শুধু কি রেজাল্টের প্যারা? আমি ফ্যামিলির বড় ছেলে। সেটার প্যারা। একটা টিউশনি আছে। সেটাও যায় যায় অবস্থা। এদিকে ভাবছিলাম ভিডিও এডিটিংটা ভালো করে শিখব। সেটাও হচ্ছে না। পেটের মধ্যে বোমা মারলেও দুইটা ইংরেজি শব্দ বের হয় না। লাইফ পুরাই প্যারাময় হয়ে গেছে।

— তুই তো দেখি প্যারা খেয়ে ট্যারা হয়ে গেছস। এখন তোর প্যারাময়তা কমাতে প্যারাসিটামল দেওয়া লাগবে। শুন—

ভালো রেজাল্ট করা, প্রেস্টিজিয়াস চাকরি পাওয়া, ফ্যামিলি সাপোর্ট করা, ইংরেজির জাহাজ হওয়া কিংবা হায়ার স্টাডি করতে চাওয়া—যেটাই তোর টার্গেট হোক না কেন। সেটা নিয়ে এক মিনিট চিন্তা করে দেখ।

যদি তোর মাথায় চার-পাঁচটা টার্গেট একসঙ্গে চলে আসে তারপরেও জাস্ট একটা নিচে লেখ। কারণ তুই একই সময়ে পাঁচটা বার্থডে পার্টিতে যেতে পারবি না। একসঙ্গে পাঁচটা সমস্যার সমাধানও করতে পারবি না। তাই চিন্তা করে দেখ। তোর কোন সমস্যাটা আগে সমাধান করার দরকার। কোন টার্গেটটাতে আগে ফোকাস করা উচিত। যাতে তুই শুধু একটা জিনিসে সিরিয়াস হতে পারস। সেই টার্গেটাই এই কাগজে লেখ।

তোর টার্গেট : _____

তুই যে টার্গেট সেট করছস, সেটা হচ্ছে তোর সামনে এগোনোর ডিরেকশন। সেটা হচ্ছে তোর কম্পাস। তোর কম্পাসের কাঁটা যেদিকে থাকবে তোকে সেদিকে এগোতে হবে। এখন আরেকটু চিন্তা করে দেখ যে তুই আজকে সারা দিনে যা যা করছস। তার বেশির ভাগ জিনিসই কি তোকে তোর টার্গেটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে? তোর টার্গেট এচিভ করতে হেল্প করছে? নাকি আজাইরা বাজাইরা ভুজং-ভাজং করতে করতে সারাটা দিন পার করে দিচ্ছস?

শুন, আমরা সারা দিনে যে যে কাজ করি, সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—লিভিং, ড্রাইভিং আর ড্রেইনিং।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

লিভিং হচ্ছে বেঁচে থাকার জন্য যে কাজগুলো সবাইকে করতে হয়। যেমন: খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো, গোসল করা, বাথরুম করা, এই সব। এইগুলো তোকে করতেই হবে। কোনো ছাড় নাই। এই লিভিং ছাড়া বাকি যে কাজগুলো করস, সেগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক হচ্ছে ড্রেইনিং, আরেকটা হচ্ছে ড্রাইভিং।

ড্রেইনিং হচ্ছে সেই কাজ, যেগুলো আজকের পর আর কোনো কাজে লাগবে না। ধর তুই যদি আজকে সারা দিন টিভি দেখে, ইউটিউবে মিউজিক ভিডিও দেখে কাটিয়ে দেস, আজকের দিনটার এই কাজগুলো তোকে ফিউচারে কোনো হেল্প করবে না। সামনে এগিয়ে নিতে কাজে লাগবে না। অর্থাৎ এই কাজগুলো করতে যে সময় দিছস, সেই সময়গুলো ড্রেনে চলে যাচ্ছে।

আর তুই যদি আজকে কিছু একটা শেখার চেষ্টা করস। নতুন স্কিল ডেভেলপ করার চেষ্টা করস। সেটা ফিউচারে চাকরিতে হেল্প করবে। তুই যদি বইয়ের একটা চ্যাপ্টার পড়ে শেষ করস। তাহলে সেটা ছয় মাস পরে পরীক্ষায় হেল্প করবে। আজকে তুই যদি ১০টা ইংরেজি ওয়ার্ড শেখার চেষ্টা করস, তাহলে ইন্টারভিউ বোর্ডে ইংরেজিতে উত্তর দিতে কাজে লাগবে। সে জন্যই এ কাজগুলো হচ্ছে ড্রাইভিং। তোকে ড্রাইভ করতেছে। সামনে এগিয়ে নিচ্ছে। একটা লক্ষ্যের দিকে টেনে নিচ্ছে। তাই সারা দিনে তোর ড্রেইনিংয়ের চাইতে ড্রাইভিং যত বেশি হবে, তোর ফিউচার তত পোক্ত হবে।

মনে রাখবি, সময় ও সিঙ্গেল মেয়ে কারও জন্য এক সপ্তাহের বেশি অপেক্ষা করে না।

আলাপ শেষ করে দুজনই হাঁটা দিল ক্যাফের দিকে। মিটিংয়ে জয়েন করতে। যদিও নুয়াজ জানে না কিসের মিটিং। তা-ও সোহান ভাইয়ের সাথে যাচ্ছে।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

লাইফ করলে অডিট, বাড়বে ক্রেডিট

মিটিং শেষ হতে হতে সন্ধ্যা ছয়টা বেজে গিয়েছিল। তাই সেখান থেকে ডাইরেক্ট টিউশনিতে চলে গেছে নুয়াজ। টিউশনি থেকে ফিরে, ডিনার করে রুমে ফিরতে ফিরতে রাত ১০টা। কিছুটা ক্লান্তি লাগলেও বসে বসে নুয়াজ ভাবল, সোহান ভাইয়ের কথাটাই ঠিক—

এক্স-রে, MRI, ECG না করলে বোঝা যাবে না হাড্ডি কই ভাঙছে, হার্টের কোথায় প্রবলেম হইছে। একইভাবে মাঝেমধ্যে লাইফের স্ক্যানিং না করলে বোঝা যাবে না স্বপ্নগুলোকে কে ভেঙে দিচ্ছে। চেষ্টাগুলোকে কে খেয়ে ফেলছে। সফলতাগুলো কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে।

তাই সে ঠিক করল সে একটা Daily Life অডিট করবে। সে জন্য সে একটা সাদা কাগজ নিয়ে বসল—কাগজের মধ্যে মাঝখানে দাগ দিয়ে বাম পাশে লিখছে 'Future Gain (Driving)' আর ডান পাশে লিখছে 'No Gain (Draining)'। তারপর চিন্তা করে দেখল আজকে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত সারা দিন কী কী করছে। যে যে কাজে ১ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় দিছে সেগুলো। যদি এমন কিছু করে থাকে যেটার বেনিফিট ছয় মাস বা এক বছর পরেও পাওয়া যাবে, তাহলে সেটা Future Gain-এর ঘরে। আর আলতু-ফালতু, ফাতরা কাজগুলো, যেগুলো ছয় মাস বা এক বছর পরে কোনো কাজে লাগবে না, সেগুলো No Gain-এর ঘরে।

Daily Life Audit			
Future Gain (Driving)	**Hr**	**No Gain (Draining)**	**Hr**
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
Total:	—	Total:	—

সবগুলো লেখা শেষ হওয়ার পর Future Gain-এর সময় যোগ করে দেখল কত ঘণ্টা হয়। সেটা নিচের টোটাল ঘরে লিখছে। সোহান ভাই বলছে,

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

স্বাভাবিক মানুষ অফিস-আদালতে ডেইলি মিনিমাম ৮ ঘণ্টা কাজ করে। তাই তার নিজের জন্য ডেইলি অন্তত ৫ ঘণ্টা সময় দেওয়া উচিত। সে জন্য সে তার Future Gain-এর টোটাল ঘরে যত ঘণ্টা হইছে। সেটাকে ৫ দিয়ে ভাগ করছে। যাতে বুঝতে পারে যে ৫ ঘণ্টা সময়ের কত ভাগ সে কাজে লাগাচ্ছে। তারপর সেই ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করে পারসেন্টে কনভার্ট করে নিছে। এটাই হচ্ছে নুয়াজের Daily X-ray Score বা সংক্ষেপে dxs। এই স্কোর ৬০ বা তার ওপরে হলে খুবই ভালো। ৬০ থেকে ২০-এর মধ্যে হলে মোটামুটি। আর যদি ২০-এর নিচে হয় তাহলে খবর আছে।

$$\text{dxs} = \frac{\text{Total Future Gain Hours}}{5} \times 100$$

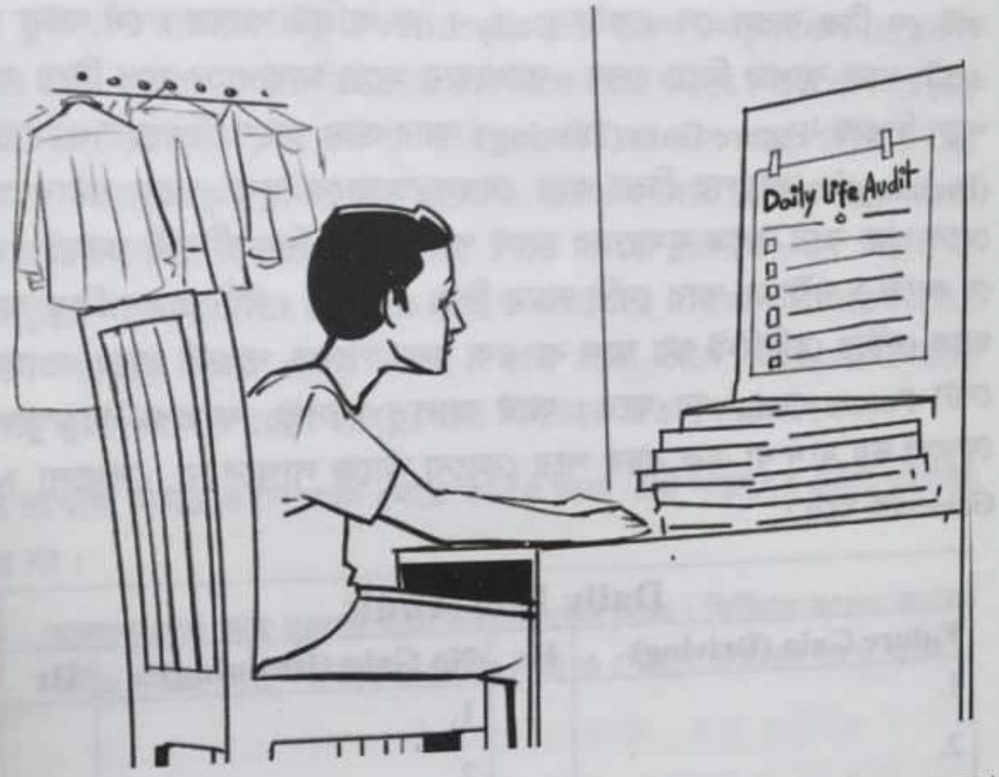

নুয়াজ হিসাব করে দেখল তার স্কোর আসছে ১৫। এইটা নিয়ে হালকা টেনশনে পড়ে গেল সে। তারপর সোহান ভাইয়ের সাজেশনমতো ছোট্ট একটা প্রেসক্রিপশন লিখছে। বাম পাশে Invest More-এর ঘরে লিখছে কালকে থেকে সে কোনো একটা কাজ আরও বেশি বেশি করবে। যাতে নেক্সট টাইম লাইফ স্ক্যান করার সময় তার dxs স্কোরের পার্সেন্টেজ বেড়ে যায়। একইভাবে ডান পাশের Waste Less-এর ঘরে লিখছে কোন কাজটা কালকে থেকে কম কম করে করবে।

Invest More	Waste Less
1.	1.

এই স্ক্যানটা করার পর নুয়াজের মনে হলো তার মাথা থেকে ভারী একটা পাথর নেমে গেছে। তারপর ভাবল, এই লাইফ স্ক্যানিংটা প্রতিদিন করবে। সম্ভব হলে কাগজ-কলম নিয়ে বসবে। আর সম্ভব না হলে ঘুমানোর আগে, চোখ বন্ধ করে এক মিনিট চিন্তা করবে, আজকের সারা দিনের কাজগুলোর মধ্যে কোনটা কোনটা ইনভেস্ট কলামে যাবে আর কোনটা কোনটা অপচয় কলামে যাবে। সেটা করলেই এক মিনিটে তার লাইফ স্ক্যান করা হয়ে যাবে।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

পুঁচকা টার্গেট দেবে, প্রেস্টিজিয়াস গিফট

আজকের সারা দিনে নুয়াজ যত কিছুই করছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগছে সোহান ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনাটা। সোহান ভাই একটু টিটকারী মারলেও ওনার মতো যত্ন করে কেউ কোনো দিন নুয়াজকে গাইডলাইন দেয়নি। সোহান ভাই বলছিল—

আমরা টার্গেট সেট করি—ক্লাসে ফার্স্ট হব, দেশসেরা লেখক হব, ইন্টারন্যাশনাল সাংবাদিক হব, UN মিশনে চাকরি করব, সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী হব, বিসিএসে ফাটিয়ে দেব।

তবে আজকের পর থেকে বড় স্বপ্ন দেখবি না, বড় টার্গেট সেট করবি না। বড় স্বপ্ন, বড় টার্গেট দিয়ে কিচ্ছু যাবে-আসবে না। কারণ যতজন বিসিএসে টেকার টার্গেট নিছে, তাদের সবার টার্গেট এচিভ হয়ে গেলে, প্রতিবছর ১০ লাখ পোলাপান বিসিএসে টিকে যেত। যতজন পরের সেমিস্টারে ফাটাই ফেলার স্বপ্ন দেখছে, তারা সবাই ফাটিয়ে দিতে পারলে, একসঙ্গে ৩০ জনকে ফার্স্ট বানাতে হতো।

তাই তুই বড় টার্গেট সেট না করে সেট করবি আজকের দিনের জন্য ছোট কিন্তু স্প্যাসিফিক একটা টার্গেট। যেটা তুই সলিড ৩ ঘণ্টা, সলিড ৫ ঘণ্টা সময় দিয়ে এচিভ করে ফেলতে পারবি। এটাই হবে তোর আজকের দিনের গোল। এটাই হবে তোর আজকের দিনের purpose। যাতে এই পারপাসটা ফুলফিল করতে করতেই তোর আজকের দিনটা হয়ে ওঠে একটা Purpose Driven দিন।

যদি তুই আজকের দিনটাকে Purpose Driven দিন বানাতে পারস। আগামী দিন, আগামী সপ্তাহকেও লাইনে রাখতে পারস, তাহলে বড় টার্গেটের রেজাল্ট পাবলিশ হওয়ার দিনটা হবে তোর সেলিব্রেশন করার দিন।

ওয়ারেন বাফেট, বিল গেটস, জ্যাক মা, জেফ বেজস, এরা কিন্তু এক দিনে বা এক বছরে সফল হয়ে যায়নি; বরং একটা বড় টার্গেটকে মাথায় রেখে, দিনের পর দিন ছোট ছোট টার্গেট এচিভ করার জন্য চেষ্টাটা ৩০-৪০ বছর ধরে করে গেছে। সে জন্যই একটা সময় পরে, তারা সফলতার বন্দরে পৌছাতে পারছে।

Be like a postage stamp— stick to one thing until you get there.
— Josh Billings

প্যারা নিরাময় ক্লিনিক

এই যে তুই, হ্যাঁ তুই। যে এই বইটা পড়তেছস। তোর জীবনের চলার গতিপথ, পুরাটা অস্থির হলে তো কথাই নাই। আর যদি কোনো কারণে প্যারার ক্যাড়া তোকে ঘিরে ধরে তাহলে প্যারা নিরাময় ক্লিনিকে চলে যাবি। সেখানে লাইফের ইঞ্জিন, তেল-মবিল, নাট-বল্টু, গুষ্টিসুদ্ধ চেক করে নিবি। পরের পাতায় প্যারা নিরাময় ক্লিনিকের অনেকগুলো গোল্লা গোল্লা দেওয়া আছে। গোল্লার পাশে কিছু কথা লেখা আছে। যদি পাশের কোনো কথা তোর জন্য সত্যি হয়, তাহলে বাম পাশের গোল্লাটা কলম বা পেনসিল দিয়ে ভরাট করে ফেলবি। আর হ্যাঁ, মাঝখানের নাম লেখার জায়গায় অবশ্যই তোর নাম লিখে ফেলবি। একই সিস্টেমে নামের নিচের গোল্লাগুলোও ভরাট করে ফেলবি।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

প্রতিদিন সকাল ৮টার আগে ঘুম থেকে উঠি
ডেইলি অন্তত ৩ ঘন্টা পড়ালেখা বা শেখার চেষ্টা করি
কবে কখন কী করতে হবে, সেটা আমি জানি
ইন্টারনেট থেকে প্রতিদিন কিছু না কিছু শিখি
দরকার হলে অন্যদের কাছে হেল্প চাই

নাম : _____

সারা দিন তো মোবাইল নিয়েই পড়ে থাকি
আড্ডা, মাস্তি গান না হলে লাইফ জমে না
আঁতেল পোলাপানদের সঙ্গে আমার মিল খায় না
রিলেশনশিপ, ফ্রেন্ড সার্কেলের প্যারার মধ্যে আছি
দরকারি জিনিসগুলোই করা হয়ে উঠতেছে না

তোর নামের ওপরের ভরাট গোল্লার সংখ্যা, নামের নিচের ভরাট গোল্লার সংখ্যার চাইতে বেশি বা সমান হলে তোর লাইফে ড্রাইভিং বেশি। আর যদি তোর নামের নিচের গোল্লা বেশি হয়, তাহলে তোর লাইফের প্রচুর সময়, সুযোগ ও সম্ভাবনা ড্রেনে হারিয়ে যাচ্ছে।

না থাকলে ফোকাস, কপাল হবে ফাটা বাঁশ

টিভিতে খেলা চলছে। হলের টিভি রুমে উপচে পড়া ভিড়। নুয়াজ ভাবল সে নিজের হলে খেলা না দেখে সোহান ভাইয়ের হলে যাবে। তাইলে খেলা দেখতে দেখতে সোহান ভাইয়ের সঙ্গে কিছু জিনিস ডিসকাস করা যাবে।

সোহান ভাইয়ের হলে গিয়ে দেখে সেখানেও টিভি রুম ভর্তি। পেছনে দাঁড়িয়ে সোহান ভাই খেলা দেখছে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল নুয়াজ। তাকে দেখেই সোহান ভাই বলে উঠল—

আজকে তো বাংলাদেশ টিমের লুজ অবস্থা। তাই তোকে আর লুজ বলব না। তো, মিস্টার-মিনিস্টার নুয়াজ। খবর কি তোর?

— খবর মোটামুটি, আটার রুটি। আপনার কথামতো একটা টার্গেট সেট করছি। কয়েকবার লাইফ স্ক্যানও করছি। পড়ালেখায় আরও বেশি সময় দেওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু ফোকাস ধরে রাখতে পারতেছি না।

ও আচ্ছা, এই কথা।

এই যে আমরা ক্রিকেট খেলা দেখতেছি। বোলার বল করতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটসম্যান সজোরে ব্যাট চালিয়ে ছক্কা হাঁকিয়ে ফেলল। এই বোলিং আর ব্যাটিং চলার মাঝখানে যে আম্পায়ার তার নাক চুলকাইল। ক্রিজের পেছনে উইকেট কিপার যে দুই পা সামনে এসে দাঁড়াল, সেটা তোর নজরে পড়বে না। কারণ তোর ফোকাস ছিল বল আর ব্যাটসম্যানের দিকে।

আমরা যখন কোনো কিছুর দিকে গভীরভাবে মনোযোগ দিই, তখন চারপাশের অনেক ছোটখাটো, মাঝারি জিনিসগুলো আমাদের চোখে পড়ে না। নজরে আসে না। এই গভীর মনোযোগ দেওয়াকে বলে, Deep Focus।

এইবার চিন্তা কর তুই মাঠে বসে খেলা দেখতেছস। তাইলে তোর সামনে থাকবে বিশাল মাঠ। তুই চাইলে বাউন্ডারির কাছে যে ফিল্ডার আছে তাকে দেখতে পাবি। মিনি মিনি সাইজের বোলার আর ব্যাটসম্যানকে দেখতে পাবি। মাঝেমধ্যে মোবাইলে সেলফি তুলতে গিয়ে একজনের আউট হয়ে যাওয়া মিস করবি। তার মানে এখন তোর ফোকাসটা টিভির সামনে বসে খেলা দেখার মতো ফোকাসড না।

আমরা যখন কোনো কিছু চিন্তা করে বের করার চেষ্টা করি। যেমন উমুককে কীভাবে প্রোপোজ করা যায় কিংবা এইখান থেকে মতিঝিল কীভাবে যাওয়া

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

যায়। এই টাইপের চিন্তা করতে গেলে এই দিক-ওই দিকের জিনিস মনে আসে। এ রকম বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনা করার সময় ফোকাস একটু কম থাকে। তাই এই ফোকাসকে বলে বিক্ষিপ্ত চিন্তা বা Diffused Focus।

বেশির ভাগ পোলাপানের পড়তে বসার সময় থাকা উচিত ডিপ ফোকাস। কিন্তু তারা Deep Focus নিয়ে পড়তে বসার চেষ্টা করে না। সে জন্যই দুই লাইন পড়তে না পড়তেই মনে আসে—কবে যে সখিনার সাথে, চন্দ্রিমা রাতে, হাত ধরে হাতে, সমুদ্রসৈকতে হাঁটব। এ রকম হাবিজাবি জিনিস মাথায় আসতে দিয়ে দেখে, দুই ঘণ্টায় দুই লাইনের বেশি পড়া হয়নি।

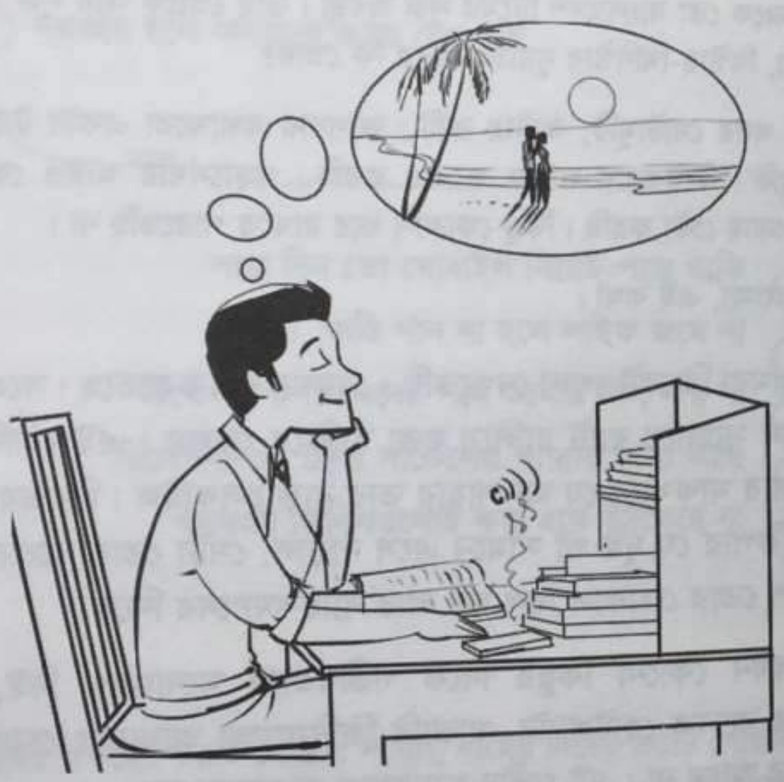

শুন, আমাদের ব্রেইন হচ্ছে বান্দরের মতো। এইটাকে যত বেশি লাই দিবি, এইটা তত বেশি এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফাইতেই থাকবে। আর যদি স্ট্রিক্ট হয়ে শক্ত কমান্ড দেস। তাইলে ব্রেইন সুবোধ বালকের মতো তোর কথা শুনতে শুরু করবে। তাই আজকের পর থেকে যখন পড়তে বসবি, তখনই নিজেকে বলে দিবি, আমি ২ মিনিট পড়ি আর ২ ঘণ্টা পড়ি। যতক্ষণ পড়ব, ১০০ ভাগ কনসেন্ট্রেশন দিয়ে পড়ব। এইটুক থেকে শুরু করে এইটুক পর্যন্ত শেষ করব। এর মধ্যে কোনো কিন্তু নাই। কোনো ছাড় নাই।

When you're hunting elephants, don't get distracted chasing rabbits.
— T. Boone Pickens

অ্যাটেনশন হইলে ফাঁস, রেজাল্ট হবে জিন্দা লাশ

ফোকাস নিয়ে বলতে বলতে, সোহান ভাই বলতে থাকল—

এই যে এত এত সোশ্যাল মিডিয়া, এত বড় ইউটিউব, কোটি কোটি ডলার দিয়ে বানায় আর তোকে ইউজ করতে দেয় ফ্রি ফ্রি। এই যে বিশাল বিশাল টুর্নামেন্টে খেলা হচ্ছে। মেগা সাইজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করতেছে। মানুষ শত শত ডলার খরচ করে মাঠে খেলা দেখতেছে। আর তুই কোনো টাকা না দিয়েই ফ্রি ফ্রি খেলা দেখতেছস। এমনকি লাখ লাখ টাকা দিয়ে বানানো টিভি নাটক, মিউজিক ভিডিও দেখার জন্য তোকে এক পয়সাও দেওয়া লাগে না। কেন?

কারণ তারা তোর কাছ থেকে টাকাপয়সা চায় না। তারা চায় তোর সময়। তারা চায় তোর অ্যাটেনশন। ওরা যদি তোর অ্যাটেনশন নিতে পারে। তাহলে সেটাকে পুঁজি করে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার কামাই করবে। আর মাস শেষে তুই পাবি ইন্টারনেটের এমবি কেনার চার্জ আর রাত জেগে বিদ্যুৎ খরচ করে খেলা দেখার ইলেকট্রিসিটির বিল।

শুন, এরা কেউই চায় না তুই লাইফে ভালো করবি, সফল হবি, স্কিল ডেভেলপ করবি; বরং এরা চায় তুই সারা দিন ওদের ওয়েবসাইটে, ওদের অ্যাপের মধ্যে, ওদের খেলা দেখার মধ্যে পড়ে থাকবি। সে জন্যই ইউটিউবে একটা টিউটোরিয়াল খুঁজতে গেলে তোকে বিশটা দেখাবে। ফেসবুকের একটা নোটিফিকেশন পেয়ে ফেসবুকে ঢুকলে, ১০০ মানুষের কিচ্ছা-কাহিনি দেখাবে।

এইগুলো সব কয়টাই এক একটা হুক, এক একটা টোপ লাগিয়ে তোকে সারা দিন সেখানে আটকে রাখতে চায়। তোকে যত বেশি সময় আটকে রাখতে পারবে, তত সময় তোকে বিজ্ঞাপন দেখিয়ে ওরা ডলার কামাবে। রিয়েল টাকা কামাবে। আর তোকে দেবে ফেইক রিওয়ার্ড। লাইক, শেয়ার আর কমেন্টের সংখ্যা। যেগুলো দিয়ে তুই একটা সিঙাড়াও কিনে খাইতে পারবি না।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

অ্যাটেনশনের দুই সাইড

মনে রাখবি, কোনো কিছুতে অ্যাটেনশন দেওয়ার দুইটা অ্যাঙ্গেল আছে—একটা হচ্ছে প্লেয়ার হিসেবে। যেমন জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা খেলায় অ্যাটেনশন দেন। কারণ এইটা তাদের ক্যারিয়ার। এইটাতে অ্যাটেনশন দিয়ে তারা কোটি কোটি টাকা কামাই করেন।

অ্যাটেনশন দেওয়ার আরেকটা সাইড হচ্ছে অডিয়েন্স বা দর্শক। আমরা যারা খেলা নিয়ে, সিনেমা নিয়ে, নাটক নিয়ে ফেসবুক, ইউটিউবে দুনিয়া উদ্ধার করে ফেলি। আমরা সবাই দর্শক। আমাদের লাভ শুধু ইন্টারটেইনমেন্ট আর সময় অপচয়। তাই এখন তুই নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে দেখ। তুই যে জিনিসটাতে সবচেয়ে বেশি অ্যাটেনশন দিচ্ছস, সেখানে তুই কি প্লেয়ার, না দর্শক।

ম্যানেজ অ্যাটেনশন

আমরা সবাই প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা করে সময় পাচ্ছি। তার মধ্যে কেউ কেউ সঠিক জায়গায় অ্যাটেনশন দিয়ে অনেকগুলো কাজ শেষ করে তর তর করে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের অ্যাটেনশন লেজার ফোকাসড থাকার কারণে সময় বা এনার্জির অভাব হয় না। আর আমরা অনেকেই আছি যারা অ্যাটেনশন ধরে রাখার চেষ্টা করি না। সে জন্য আমাদের অ্যাটেনশন চুরি হয়ে যায়।

তাই আজকের পর থেকে অ্যাটেনশন ম্যানেজ করবি। আর অ্যাটেনশন ম্যানেজ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে টেকনোলজি ম্যানেজ করা। তার মানে মোবাইল, ল্যাপটপ ও ইন্টারনেট ব্যবহার কন্ট্রোল করবি। একটু একটু করে অ্যাটেনশন বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবি।

অ্যাটেনশন অডিট

মাঝেমধ্যেই লাইফ স্ক্যান করার মতো করে অ্যাটেনশন অডিট করবি। জাস্ট দুই মিনিট চিন্তা করে দেখবি—আজকে কোন কোন জিনিসে অ্যাটেনশন দিছস। কোন জিনিস তোর মাথার ভেতরে ঘুরপাক খাইছে। কোন জিনিস সামনে আসলে সেটার মধ্যে হারিয়ে গেছস। এরপর চিন্তা কর—আচ্ছা, আমার কোন জিনিসে অ্যাটেনশন বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। আর কোন কোন জিনিসে অ্যাটেনশন কমিয়ে দেওয়া উচিত। তাহলেই তোর অ্যাটেনশন অডিট হয়ে যাবে।

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবি—লাইফের ইমোশন, টাকাপয়সা, সময়, পরীক্ষার রেজাল্ট, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, ফ্রেন্ডশিপ, রিলেশন, সবকিছু মেইনটেইন করা পানির মতো সহজ হয়ে যাবে, যদি তুই তোর অ্যাটেনশন ম্যানেজ করতে পারস।

The successful warrior is the average person, with laser-like focus.
— Bruce Lee

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

অনিয়ন্ত্রিত মোবাইল, লাইফ ধ্বংস করার হস্তী

খেলা শেষ করে ক্যানটিনে এসে বসল দুজনে। বিকেলের ছোলা, পুরি শেষ। আছে শুধু মোগলাই পরোটা। তাই মোগলাই পরোটার অর্ডার দিয়ে সোহান ভাই বলতে শুরু করল—

আচ্ছা, তোর লাইফটা কন্ট্রোল করে কে? উত্তর হচ্ছে, স্মার্টফোন। এই স্মার্টফোনে একটা নোটিফেকশন আসলে, পরের এক-দেড় ঘণ্টা তোকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথম যাকে দেখস, সে হচ্ছে স্মার্টফোন। ক্লাসে যাওয়ার পথে তোর সঙ্গে থাকে স্মার্টফোন। ক্লাসে, বাসে, ডাক্তারের চেম্বারে, পড়ার টেবিলে যার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকস, সে হচ্ছে স্মার্টফোন। এমনকি রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়েও চলে স্মার্টফোন।

এই স্মার্টফোনের জন্য পরীক্ষার রেজাল্ট, চাকরির প্রিপারেশন, প্রেজেন্টেশন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, GRE পড়াসহ লাইফের অলিগলি আনারকলি সব তেজপাতা হয়ে যাচ্ছে। গেমস, মেসেঞ্জার, ইউটিউব, ফেসবুক, সকাল-বিকাল খেয়ে দিচ্ছে তোর স্বপ্নগুলোকে।

১. মোবাইল আসলে কতক্ষণ ব্যবহার করস। কতটুকু অ্যাডিকটেড হয়ে গেছস। সেটা সঠিকভাবে বোঝার জন্য একদিন মোবাইল বন্ধ রাখার চ্যালেঞ্জ নিয়ে দেখ। এইটাকে বলবি, মোবাইল থেকে রোজা (Mobile Fasting)। মোবাইল থেকে রোজা রাখার জন্য একদিন রাতে ঘুমানোর সময় মোবাইল অফ করে দিবি। পরের দিন সারা দিন মোবাইল অন করা যাবে না। সেদিন পার হওয়ার পরের দিন সকালে গিয়ে অন করতে পারবি।

প্রথমবার চেষ্টা করলে হয়তো দুই-তিন ঘণ্টার বেশি নিজেকে আটকে রাখতে পারবি না। তবুও এক দিন পরে আবার অ্যাটেম্পট নিবি—মোবাইল ফাস্টিং করতে। দরকার হলে মোবাইলের ব্যাটারি খুলে ফ্রেন্ডকে দিয়ে দিবি এক দিনের জন্য। এভাবে চার-পাঁচবার চেষ্টা করে যদি একবার ২৪ ঘণ্টা ফোন ছাড়া থাকার চ্যালেঞ্জ কমপ্লিট করতে পারস, তাহলে প্রমাণিত হবে তুই মোবাইলের শিকল থেকে মুক্ত।

২. আমরা মনে করি মোবাইলে হাংকি-পাংকি করে দুনিয়া উল্টায় ফেলব। টিউটোরিয়াল দেখব। তমুক স্কিল ডেভেলপ করে ফাটিয়ে ফেলব। দিন শেষে যখন লাইফ স্ক্যান করতে যাবি, তখন দেখবি স্কিল ডেভেলপমেন্টের ভিডিও দেখছস দুইটা, হাবিজাবি আজাইরা ভিডিও দেখছস চল্লিশটা।

৩. আর যারা বলে, বালিশের পাশে মোবাইল অন রেখে ঘুমাই। কারণ রাতে কোনো ইমার্জেন্সি ফোন আসতে পারে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করি, গত ছয় মাসে কয়টা জরুরি ফোন আসছে? আর কয়দিন ইমার্জেন্সি কল আসার নাম ভাঙিয়ে মোবাইল টিপতে টিপতে রাত দুইটা বাজাই দিছস?

শুন, মোবাইল অন না থাকলে, ফেসবুকে লগইন করা না থাকলে, তোর যতটুকু লস হবে। সেটাতে লগইন করে থাকার কারণে চৌদ্দ গুণ বেশি সময় নষ্ট হয়। তা ছাড়া তুই এমন কেউ হয়ে যাস নাই যে তুই একদিন মোবাইল বন্ধ রাখলে, তোর ফ্রেন্ডরা তোর রিপ্লাই, কমেন্টের অভাবে না খেয়ে মরে যাবে। তোর ইনবক্সের রিপ্লাই না পেয়ে বিশ্বনেতারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে ফেলবে।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

৪. মোবাইলে কী কী ইনস্টল করা আছে, সেগুলো মাঝেমধ্যে চেক কর। কম দরকারি বা অদরকারি অ্যাপগুলো আনইনস্টল করে ফেল। যেগুলো ঘন ঘন নোটিফিকেশন দেয়, সেগুলোর সেটিংসে গিয়ে নোটিফিকেশন অফ করে দে। তাহলে ওরা যখন চাইবে, তখন তোকে অ্যাপের ভেতরে টেনে নিতে পারবে না; বরং তুই যখন চাইবি, যখন তোর দরকার হবে, তখন তুই অ্যাপের মধ্যে যাবি।

ভিডিও এডিটিং, প্রোগ্রামিং, ফটোগ্রাফি, ইংরেজি শেখা থেকে শুরু করে এমন কোনো কাজ নাই যেটা মোবাইল দিয়ে করা যায় না। তাই মোবাইল যদি বেশি বেশি ইউজ করতেই হয়। তাহলে প্রোডাক্টিভ কাজে বেশি বেশি ব্যবহার কর।

ক্যালকুলেটেড মাস্তি, ফিউচারের স্বস্তি

প্রায় ২৫ মিনিট পরে এল মোগলাই পরোটা। খেলা শেষে সবাই একসঙ্গে এসে মোগলাই পরোটা অর্ডার দেওয়ায়, চাপ বেড়ে গেছে। সেই মোগলাই দিয়ে খিদার আগুন নেভাতে নেভাতে সোহান ভাই বলল—

আমার মনে হচ্ছে তোর লাইফটা এক দিকে একটু বেশি ঝুঁকে গেছে। তাই তোকে কিছুটা পেছনে গিয়ে একটু একটু করে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। কারণ—

স্টুডেন্ট লাইফটা শুধু পড়ালেখার না। আবার স্টুডেন্টলাইফটা শুধু আড্ডাবাজিরও না। এই সময়ে তুই আড্ডা দিবি, ঘুরতে যাবি, মাস্তি করবি। সিরিয়াসলি ক্লাস করবি, আবার সময়দৃষ্টে ক্লাসের সবাই মিলে ক্লাস বাংক মারবি। সিনেমা দেখবি, পাঠ্য বইয়ের বাইরের বই পড়বি, চান্স পাইলে প্রেম করার চেষ্টা করবি। আবার মাঝেমধ্যে একটু আধটু-বিটলামিও করবি। তাইলেই তোর স্টুডেন্ট লাইফটা ভন্ডুল না হয়ে, তোর লাইফের সেরা সময় হয়ে উঠবে।

তবে লাইফ বৈচিত্র্যময় বানাতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলবি না; বরং বিটলামির সঙ্গে সিরিয়াসনেসের একটা ব্যালেন্স রাখার জন্য একটা মাস্তি কন্ট্রোলার সঙ্গে রাখবি। এই মাস্তি কন্ট্রোলারে তিনটা বাটন থাকবে। মাস্তি অন, মাস্তি স্লো আর মাস্তি অফ। সেমিস্টার শেষ এর পরে যখন গ্যাপ আসবে বা সেমিস্টারের শুরুর দিকে যখন প্রেসার থাকবে না, তখন হবে মাস্তি অন। ইচ্ছেমতো যা খুশি করবি। সিনেমা দেখতে মন চাচ্ছে। একটানা চারটা সিনেমা দেখে ফেলবি। কোথাও ঘুরতে যেতে ইচ্ছে করতেছে, কয়েকজন মিলে চলে যাবি।

আবার যখন ক্লাস টেস্ট আসবে বা প্রজেক্টের রিপোর্ট জমা দিতে হবে, তখন দুই দিনের জন্য মাস্তি স্লো করে দিবি। কাজটা শেষ করে আবার মাস্তি মুড অন করে দিবি। এই কন্ট্রোল থাকাটা জরুরি। নচেৎ লাইফ, আশকারা পেয়ে তালগাছে উঠে যাবে। আর যখন সেমিস্টার ফাইনাল চলে আসবে, তখন মাস্তি মুড অফ করে দিয়ে সিরিয়াস হয়ে যাবি।

ওভারঅল একটা জিনিস মনে রাখবি—সারা সেমিস্টার মাস্তি, সিনেমা, নাটক, ট্রল, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটি, ক্লাস, ঘোরাফেরা, আলতা পালিশ লাগানো, রিলাক্স করার জন্য সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ সময় দিবি। আর

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

বাকি ২০ শতাংশ সময় দিবি স্কিল ডেভেলপমেন্ট, ক্লাসের পড়া, ক্লাসটেস্টের জন্য পড়া, অ্যাসাইনমেন্ট, ইংরেজি শেখা এইগুলোর জন্য। আবার যখন পরীক্ষার সময় আসবে, তখন জাস্ট বিপরীত জিনিসটা করবি। ৮০ শতাংশ সময় সিরিয়াস পড়ালেখা। বাকি ২০ শতাংশ সময় রিলাক্স। তাহলে তোর লাইফটাতে একটা ব্যালেন্স থাকবে।

এই ৮০ আর ২০ শতাংশের কথা ১৮৯৬ সালে ইতালির Vilfredo Pareto আংকেল বলে গিয়েছিলেন। ওনার কথাটা হালকা একটু ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, তুই সারা সেমিস্টার এনজয়, ইভেন্ট অর্গানাইজ, আউট নলেজ, লিডারশিপ, ইংরেজি বা হাবিজাবি স্কিল ডেভেলপ করার জন্য যে ৮০ শতাংশ সময় দিবি, সেটা তোর ক্যারিয়ারে ২০ শতাংশ ইমপ্যাক্ট ফেলবে। আর তুই সারা সেমিস্টার, প্রতিদিন ২০ শতাংশ করে যে সময় দিবি, সেটাই তোর রেজাল্টে, তোর ক্যারিয়ারে ৮০ শতাংশ ইমপ্যাক্ট ফেলবে।

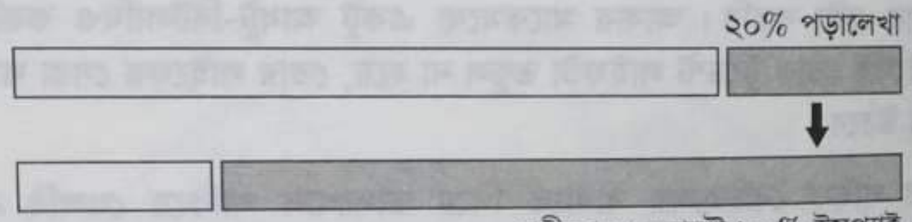

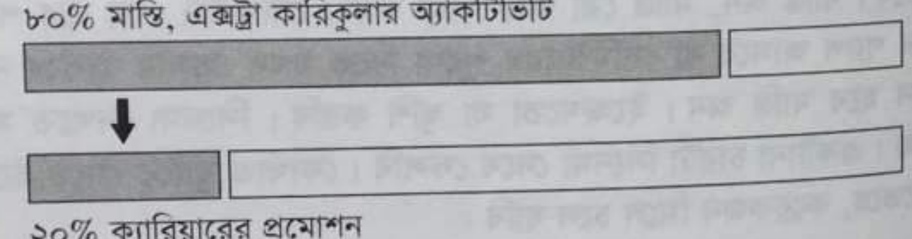

এখন একটু ক্যালকুলেশন কর। এক দিনে সময় আছে মোট ২৪ ঘণ্টা। ধরলাম তুই ডেইলি ৮ ঘণ্টা ঘুমাস। বাকি যে ১৬ ঘণ্টা জেগে থাকস। এই ১৬ ঘণ্টা সময়ের ২০ শতাংশ হয় ৩ দশমিক ২ ঘণ্টা। এইটাকে রাউন্ড করে ধরলাম ৩ ঘণ্টা। প্রতিদিন মিনিমাম ৩ ঘণ্টা সময় পড়ালেখার পেছনে দিলে তুই ক্লাসে টপ ১০ জনের মধ্যে থাকবি। সো, সারা সেমিস্টার যতই আড্ডা, মাস্তি করস না কেন ২০ শতাংশ সময় সলিড পড়ালেখার জন্য রেখে দিবি। তাহলে লাইফে এনজয়, মাস্তি দুইটাই করা হবে। আবার লাইফ একটা সফট ডিসিপ্লিনের মধ্যেও থাকবে।

অ্যাটেনশন প্রিভেনশন ক্লিনিক

বাঙালির প্রথম সমস্যা—আমাশয়। দ্বিতীয় সমস্যা—উদরাময়। আর এই দুইটার চাইতেও বড় সমস্যা—প্যারা নিরাময়। তাই সব প্যারার জন্য প্যারাসিটামল না খুঁজে, শুধু অ্যাটেনশন চুরি হয়ে যাওয়ার প্যারা ঠেকাতে অ্যাটেনশন প্রিভেনশন ক্লিনিকে চলে যা। সেখানে দেখবি একটা 'অ্যাটেনশন লস চেইন'-এর মাঝখানে কিছু গোল্লা গোল্লা গিঁট দেওয়া আছে। যদি গিঁটের ডানপাশের কাজগুলো তুই নিয়মিত করে থাকস, তাহলে গিঁটের গোল্লার ঘরে ৫ লিখবি। যদি ডানপাশের কাজগুলো মাঝেমধ্যে করে থাকস, তাহলে ৩ লিখবি। আর যদি তেমন খোঁজখবর না রাখস, তাহলে ০ লিখবি। খুবই সিম্পল একটা ব্যাপার।

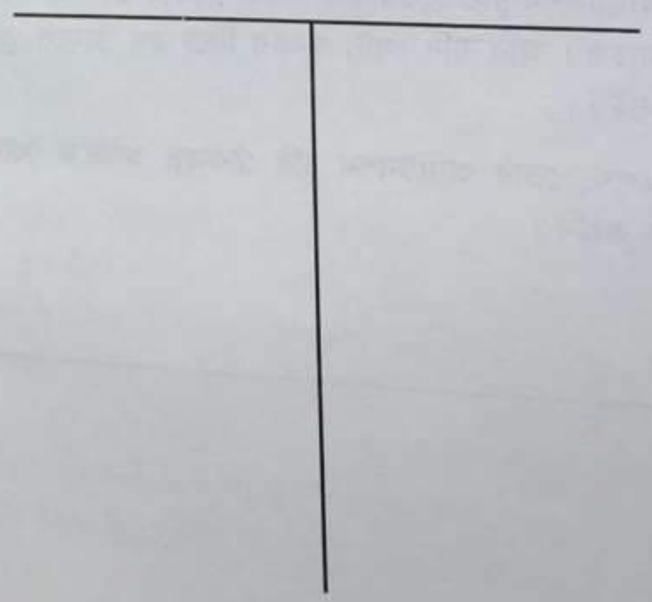

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

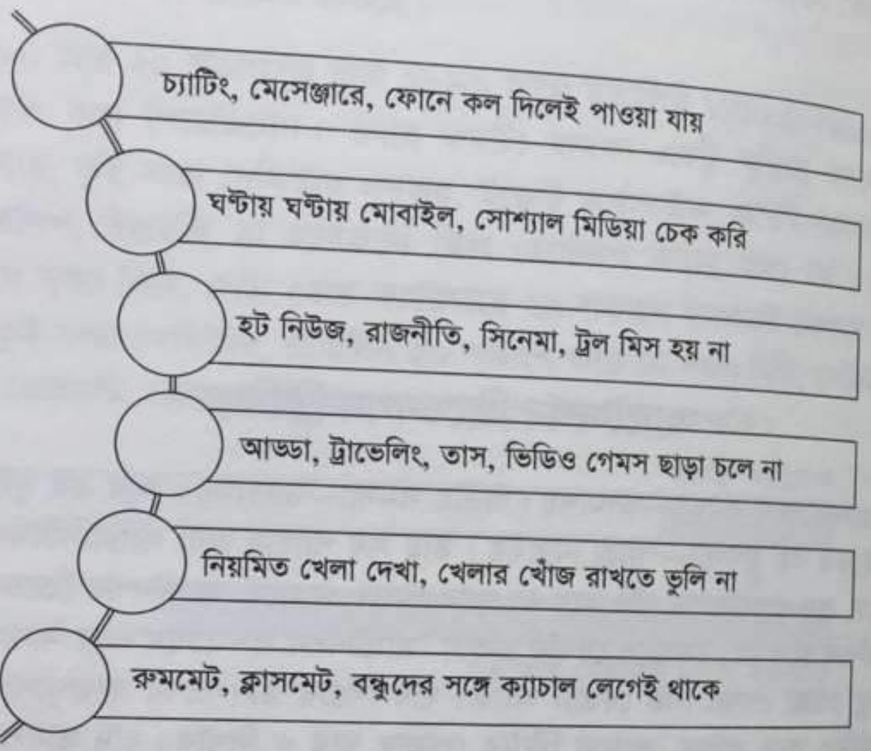

যদি তোর গিঁটের সবগুলো সংখ্যার যোগফল ১৫-এর বেশি হয় তাহলে প্রতিদিন তোর অনেক অ্যাটেনশন চুরি হয়ে যাচ্ছে। যদি ৭ থেকে ১৫-এর মধ্যে হয় তাহলে তুই নরমাল আছস। আর যদি সেটা ৭-এর নিচে হয় তাহলে তুই রসকষহীন বোরিং টিউব লাইট।

এইবার নিচে লেখ, তোর অ্যাটেনশন চুরি ঠেকাতে আজকে থেকে তুই কোন কাজটা কন্ট্রোল করবি।

মাইক্রোশিফট করলে, লাইফ হয় না গুবলেট

সোহান ভাইয়ের বুদ্ধি পেয়ে নুয়াজ একটু একটু করে তার ফোকাসগুলোকে লাইনে রাখার চেষ্টা করছে। মোবাইলের ওপর নির্ভরশীলতা কন্ট্রোল করা শুরু করছে। এভাবে কয়েক সপ্তাহ চলার পর সে ভাবল, সোহান ভাই বলছিল—

লাইফে মাস্তি করার পার্টনার পাবি, টাইম নষ্ট করার অপশন পাবি, খারাপ কাজ করার ফ্রেন্ড পাবি কিন্তু ভালো কিছু করার সঙ্গী-সাপোর্ট পাবি না; বরং একটু ভালো কিছু শুরু করলেই দেখবি, কাছের বন্ধুরা হিংসা করছে, দূরের বন্ধুরা টিটকারী মারছে। ডিফরেন্ট কিছু করার চেষ্টা করলেই ফ্যামিলির মেম্বাররা সতর্ক করবে, পাশের বাসার আন্টিরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে।

কারণ তোর চারপাশের অলস ফ্রেন্ডরা চায় না তুই পরিশ্রমী হবি, ফ্যামিলি মেম্বাররা চায় না তুই তাদের চিন্তার বাইরে কিছু করবি। নিজেদের লাইফে ব্যর্থ মুরব্বিরা চায় না, তাদের চাইতে তুই বেশি সফল হবি। সিস্টেমের বাইরে গিয়ে কিছু করার চেষ্টা করলেই চারপাশে দেয়াল দিয়ে তোকে আটকে রাখার চেষ্টা করবে। ফাপর মারবে। তোকে ঢ্যাড়স বানিয়ে রাখতে চাইবে। ভেটকি হাসি দিয়ে বাম্বু মারবে। এগুলোই বাস্তবতা। এখানে জীবনযুদ্ধে সামনে ঠেলে দেওয়ার লোক পাওয়া যায় না কিন্তু পেছনে টেনে ধরা পাবলিকের অভাব হয় না।

তবে এই সিস্টেম দিয়ে সমাজের ৯৯ শতাংশকে আটকে রাখতে পারলেও ১ শতাংশ আছে যারা সব গ্যাঞ্জামের ভেতর থেকে ঠিকই বাধার দেয়াল ফুটা করে ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে পড়ে। টিনের চাল ছিদ্র করে হলেও আকাশ ছুতে শুরু করে। সব ধানাই-পানাই, বাধা-বিপত্তির মাঝখানেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, এগোতে পারে।

কারণ ওরা যুদ্ধটা পরিপার্শ্বের সঙ্গে করে না। ফ্যামিলি রেস্ট্রিকশনের বিরুদ্ধে লড়ে না। কারও পারমিশন পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে না; বরং ওরা নীরবে-নিভৃতে নিজের বিরুদ্ধেই যুদ্ধটা চালাতে থাকে। তাদের যুদ্ধ চলে নিজের আয়েশ করার, কম্প্রমাইজ করার, ফাঁকিবাজি করার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। সকালে উঠে ওরা দুই ঘণ্টা ইন্টারনেটকে গিফট না করে, নিজের লেভেলটাকে বাড়িয়ে নিতে ইনভেস্ট করে। স্কিল ডেভেলপ করার রাস্তা খোঁজে। চেষ্টাকে এফিশিয়েন্ট বানানোর বুদ্ধি বের করে, ট্রাই করে।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

ওরা কারও কাছ থেকে সাপোর্ট না পেলে স্ট্যাচু হয়ে বসে থাকে না। কেউ ব্রেক-থ্রু দেবে, সেই আশায় অপেক্ষা করে না। একদিনে দুনিয়া উল্টে ফেলার স্বপ্ন দেখে না; বরং তারা চায় কালকের চাইতে আজকে আরেকটু বেশি চেষ্টা করতে। নিজের ভেতরে পজিটিভ মাইক্রো লেভেলের চেইঞ্জ আনতে হবে। বাকি সব অপূর্ণতা, অসামঞ্জস্যতাগুলো অ্যাডজাস্ট করে নিজের মধ্যে ছোট্ট একটা পরিবর্তন আনতে। কালকের চাইতে আজকে একটু বেশি সময় ইনভেস্ট করতে। কারণ ওরা জানে : Success is not an accident. It's the outcome of small positive changes that you keep adding over a long period of time.

এমন না যে তোকে মাথা ন্যাড়া করে ফেলতে হবে। সবকিছু ছেড়েছুড়ে খোদার খাসি হয়ে যেতে হবে। তা কিন্তু না; বরং তোকে হালকা একটু চেইঞ্জ করতে হবে। দরকার হলে সেটা ১ ঘণ্টার পরিবর্তন। না হলে আধা ঘণ্টার বা ১০ মিনিটের পরিবর্তন। সেটা হতে পারে সকালে ঘুম থেকে উঠে তুই ১০ মিনিট পড়বি। তারপর মোবাইল চেক করবি। নাশতা খাবি। পত্রিকা পড়বি। যেটাই ইচ্ছে হয় সেটা করবি। কিন্তু তার আগে ১০ মিনিট পড়বি। এই ১০ মিনিট সময় তুই যদি নিজেই নিজের জন্য বের করতে না পারস, তাহলে তুই আসলে তোর নিজের ভালো চাস না। কারণ তুই দুনিয়ার এমন কোনো ব্যস্ত পাবলিক না যে তুই নিজের জন্য ১০ মিনিট খুঁজে বের করতে পারবি না।

এটাই হচ্ছে তোর সিম্পল চেইঞ্জ। এটাই হচ্ছে তোর মাইক্রো শিফট। এটাই হচ্ছে তোর নিজের কাছে তোর নিজের কমিটমেন্ট। এই সিম্পল চেইঞ্জটা কন্টিনিউ করতে পারলে একটু একটু করে তোর গাড়ি আবার লাইনে আসতে শুরু করবে। সেটা না করতে পারলে আজীবন অন্যের দয়ার ওপর বেঁচে থাকতে হবে।

Hope is a good breakfast, but it is a bad supper. — Francis Bacon

পড়া নিয়ে খেলা করে, নাকের ডগার হেলমেট

মাঝেমধ্যে নুয়াজ হিসাব মেলাতে পারে না। সে তো আগে পড়ালেখায় বাতাবিলেবু ছিল না। স্কুলজীবনে কখনোই রেড সিগন্যাল খায়নি। অথচ এখন হরহামেশাই রেড সিগন্যাল খেয়ে ল্যাটামাছ হয়ে বসে থাকে। তাই একদিন বসে বসে সে চিন্তা করতে থাকল—

এই আমিই কোচিং সেন্টারে, স্যারের বাসায়, স্কুলের পরীক্ষায়, এমনকি প্রাইভেট টিউটরের সামনে দাপিয়ে বেড়াতাম। সেই আমিই এখন ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চে বসে মাথা লুকিয়ে রাখি, টিচারদের দৃষ্টি এড়াতে। যেই আমি চেয়ার-টেবিলে বসলেই, কোচিংয়ে ভাইয়ার লেকচার শুনলেই, অর্ধেক পড়ালেখা হয়ে যেত; সেই আমিই এখন পড়ালেখায় আগ্রহ পাচ্ছি না।

এই রকম কেন হলো? হয়তো এই আমি, এখন আর আগের 'আমি'র মতো নাই। আগে আমার স্মার্টফোন ছিল না। প্রিয়জন ছিল না। আগে খেলা দেখা, সোশ্যাল মিডিয়া, সিনেমা নিয়ে এত বেশি খোঁজ রাখতাম না।

তাহলে এখন কি আর আমাকে দিয়ে ভালো গ্রেড পাওয়া, ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব হবে না? হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। তবে যেটাই হোক না কেন, একটু মোজ মাস্তি তো করাই যায়। পড়াকে প্রেসার হিসেবে না নিয়ে, পড়াকে একটা খেলা হিসেবে নেওয়া যায়।

১. পড়ার সঙ্গে T-২০

দিনে বেশ কয়েকবার নুয়াজকে হলের বাইরে বা মেসের বাইরে যেতে হয়। সে ঠিক করল, প্রতিবার বের হওয়ার আগে ২০ মিনিটের ছোট্ট একটা গেম খেলবে। এই গেমটা হচ্ছে ২০ মিনিটের মধ্যে কোনো একটা জিনিস পড়ে শেষ করে ফেলার গেম। এই যে ২০ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে, এইটা হচ্ছে তার টার্গেট। আর ২০ মিনিট সময়টা হচ্ছে টাইম। তাই প্রতিবার হল, বাসা বা মেস থেকে বের হওয়ার আগে ২০ মিনিটের টাইম Vs টার্গেট খেলা শুরু করে দেয় সে। চ্যালেঞ্জ নেয় যে ২০ মিনিটের মধ্যে টার্গেটটা ফিনিশ করতে পারে কি না। যদি ফিনিশ করতে পারে, তাহলে টার্গেট জিতে গেল। আর যদি না পারে তাহলে টাইম জিতে গেল। প্রতিদিন এভাবে দুই-তিনবার করে টার্গেট Vs টাইম কম্পিটিশন লাগায় দিলে এই চান্সে তার ছোটখাটো অনেক জিনিস পড়া হয়ে যায়।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

২. ফিক্সড গ্যাটিস গেম

কয়েক দিন টার্গেট vs টাইম T-২০ খেলতে খেলতে নুয়াজের মাথায় আরেকটা আইডিয়া এল। সে দেখল দুনিয়ার সবাইকে খাওয়াদাওয়া, গোসল, বাথরুম করা, ফটোকপি করা, মোবাইলে এমবি ঢোকানো—এই সব নির্দিষ্ট কিছু কাজ করাই লাগে। এই কাজগুলো একটার পর একটা করলেও কোনো সমস্যা নাই; মানে গোসলের পর খাওয়া, খাওয়ার পর ব্যাংকে যাওয়া। ব্যাংক শেষে টিউশনিতে যাওয়া। অথচ একটানা ২ ঘণ্টা ম্যাথ করার পর আরও দুই ঘণ্টা ফিজিকস পড়া বেশির ভাগ মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয় না। মজা লাগে না। তাই সে ঠিক করল, ফিক্সড কাজগুলোকে গ্যাটিস হিসেবে রাখবে; অর্থাৎ দুই ঘণ্টা পড়া শেষ হওয়ার পর গোসল করে ফেলবে। তারপর এক ঘণ্টা পড়ে খাইতে যাবে। খেয়ে এসে আরও দুই ঘণ্টা পড়ে তারপর দরকার হলে মোবাইলে এমবি ঢোকাতে যাবে। এইভাবে পড়ার গ্যাপেগুপে অন্য কাজগুলো সেট করলে, তার পড়ার মাঝে একটু বিরতি হলো। আবার কাজগুলোও করা হয়ে গেল।

৩. টাইম বের করার ট্রায়াল অ্যান্ড এরর গেম

পড়ার মোক্ষম সময় বের করতে পারাও একটা চ্যালেঞ্জ। নুয়াজ শুরু করল ট্রায়াল অ্যান্ড এরর গেম। এই গেমটা খুবই সিম্পল। সে টানা চার দিন চেষ্টা করল সকালে উঠে পড়তে। দেখল ঠিকমতো অ্যালার্ম সেট করে সে উঠতে পারে কি না। পড়াটা ইফেক্টিভ হচ্ছে কি না। যদি হয় তাহলে সেটা সে কন্টিনিউ করতে থাকে। না হলে সবাই ঘুমিয়ে যাওয়ার পর রাত জেগে পড়তে শুরু করে। আবার দুপুরে খেয়েদেয়ে সবাই যখন আরামের ঘুম দেয়, নুয়াজ তখন কষ্ট হলেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুম আটকিয়ে পড়ে।

নুয়াজ ঠিক করল সে পরীক্ষার জন্য না বরং ক্লাসে যে যে জিনিস পড়াইছে, সেগুলোর সামারি লেখার জন্য পড়বে। পরের দিন ক্লাসে গিয়ে স্যারকে প্রশ্ন করতে পারার জন্য সে পড়বে। ক্লাসমেটদের বোঝানোর জন্য পড়বে। এইভাবে ছোট ছোট কারণে পড়লে প্রতিদিন পড়া শেষ করার একটা কারণ থাকবে।

ইফেক্টিভ লাইফস্টাইলকে মন্ত্রী বলে যক্ষা

পরীক্ষার আগে নুয়াজ সব সময় সিরিয়াস হয়ে রুটিন বানায়। কিন্তু রুটিন যতই ভালো হোক না কেন, দুই দিনের বেশি ফলো করতে পারে না। তাই সে ভাবতেছে সমস্যাটা কোথায়? তখন সে লক্ষ করল, বেশির ভাগ সময়—

সে ঘুম থেকে ওঠে সকাল ৭টা, ৮টায় আর রুটিন বানায় ভোর ৫টা থেকে!! এইডা কিছু অইল? তা ছাড়া সারা বছর আমজনতা হিসেবে টইটই করে ঘোরে। আর একলাফে আর্মি স্টাইলে রুটিন ফলো করার চেষ্টা করে। এতে কোনোটাই ঠিকমতো হয় না। কারণ রুটিন ফলো করা এক কথা। আর রুটিনের নামে লাইফস্টাইল চেইঞ্জ করা আরেক কথা। তাই সে ঠিক করল, এইবার আর রুটিন বানাবে না; বরং সেমিস্টারের শুরু থেকে একটু একটু করে রুটিন বিল্ড করতে শুরু করবে।

একটা রুটিনকে ইফেক্টিভ বানাতে হলে, সেটা লাইফস্টাইলের সঙ্গে ম্যাচ খেতে হবে। তা ছাড়া একটা রুটিনে সিরিয়াসলি পড়ালেখা করার টাইম থাকবে। আবার রিলাক্স করার টাইমও থাকবে। আবার এক দিন পেট খারাপ হয়ে রুটিন মিস করলে সেটা মেকআপ করার অপশন থাকবে। একটা মাস্তি মাস্তি ফিলিংস আসতে হবে। নচেৎ রুটিন ফলো করা আর জেলখানায় আটকে রাখা একই রকম হয়ে যাবে।

আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে—সারা দিনে কী কী করছে, সেটা হিসাব করলে হয় ৩-৪ ঘণ্টা। অথচ ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকালে দেখা যায় সারা দিনের সময় হচ্ছে ২৪ ঘণ্টা। বাকি সময়গুলো কই যায়? কোন চিপা দিয়া পালায়? এই সময়গুলোকে রিয়েলাইজ করতে না পারলে একটা না, এক হাজার রুটিন বানিয়েও কোনো লাভ হবে না। তাই নুয়াজ ঠিক করল সে আগে বোঝার চেষ্টা করবে, তার সময়গুলো কই যায়।

১. সেলফ রিয়েলাইজেশনের গলি খোঁজা

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর নুয়াজ খেয়াল করতে শুরু করল তার আসলে প্রতিদিন ২ ঘণ্টা যায় হুদাই মোবাইল টিপাটিপি করতে। ৩ ঘণ্টা যায় সোশ্যাল মিডিয়ার পেছনে। এক-দেড় ঘণ্টা যায় আড্ডা দিতে। তারপর সে চিন্তা করল, তাকে এই সত্যের মুখোমুখি হতে হবে। তাই একদিন সকালে

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

ঘুম থেকে উঠে সে নিজেই নিজেকে বলছে, আমি আজকে ২ ঘণ্টা মোবাইল টিপাটিপি করব, আজকে ৩ ঘণ্টা ফেসবুক ঘাঁটাঘাঁটি করব।

এই সত্যি কথাটাই বলতে গিয়ে তার গলাটা কেঁপে উঠল। মাথার ভেতরে একটা প্রশ্ন এল? সত্যিই কি আমার এতগুলো সময় প্রতিদিন নষ্ট করা উচিত? একটা গিল্টি ফিলিংস আসতে শুরু করল। তারপর সে আরেকটু চিন্তা করল একলাফে সব চেইঞ্জ করতে চাইলে লাভ হবে না। আগেও চেষ্টা করছিল, এক দিনে সব চেইঞ্জ হয় না। তাই নতুন সিস্টেম অ্যাপ্লাই করবে সে।

২. অ্যানালগ টাইমবক্স

আগে যা যা করত সব ঠিক রেখে সারা দিনের মধ্যে জাস্ট এক ঘণ্টা সময় সেট করছে। এই এক ঘণ্টা হচ্ছে তার টাইমবক্স। আরও সঠিকভাবে বললে, এই এক ঘণ্টা হচ্ছে তার 'আইসোলেটেড অ্যানালগ টাইমবক্স'। এই এক ঘণ্টা সে মোবাইল, ইন্টারনেট কিছুই ব্যবহার করবে না। জাস্ট বইখাতা আর কলম নিয়ে বসবে এবং দুনিয়া উল্টে গেলেও সে তার টাইমবক্স সঠিক সময়ে পালন করবে।

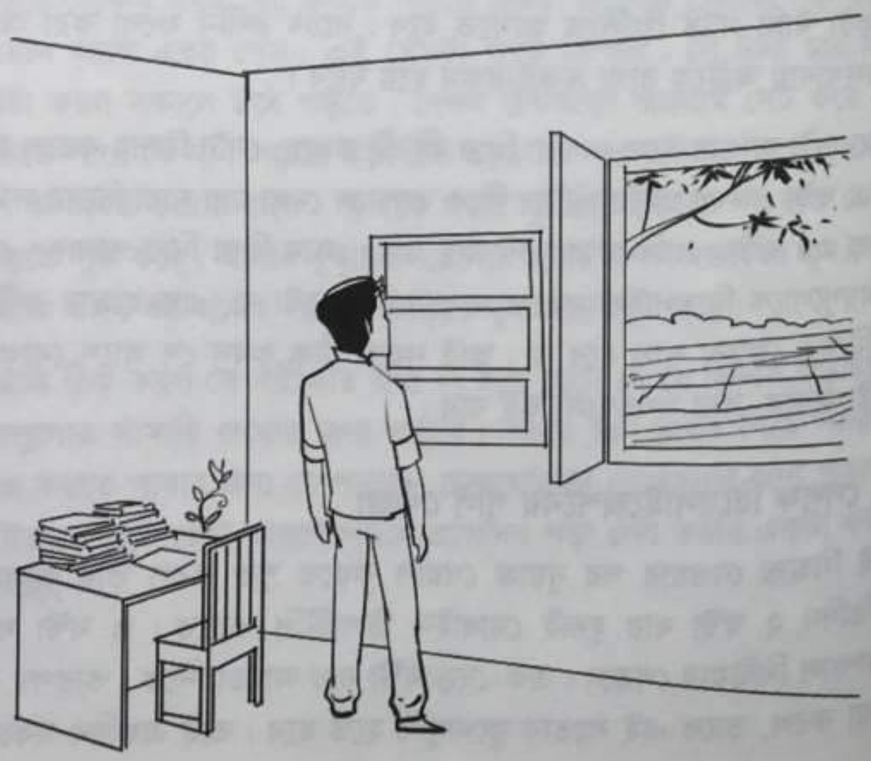

এই আইসোলেটেড অ্যানালগ টাইমবক্সের কাজটা টানা পাঁচ দিন করার টার্গেট নেয় সে। তিন দিন পরে এক দিন গ্যাপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার পাঁচ দিনের টার্গেট নিয়ে শুরু করছে। তার কাছে এক একটা টাইমবক্সে কী শিখতেছে, সেটা ব্যাপার না। ব্যাপার হচ্ছে সে এক ঘণ্টা ডেডিকেটেড সময় দিতে পারছে কি না। টানা পাঁচ দিন দিতে পারতেছে কি না।

৩. বিল্ড ইউর রুটিন

একটা টাইমবক্স রেগুলার পালন করতে পারা মানে লাইফস্টাইলের ওপর এক ঘণ্টার মাইক্রো লেভেলের একটা কন্ট্রোল যোগ করা। নুয়াজ ডিসিশন নিল সে আগের টাইমবক্স ঠিক রেখে আরেকটা টাইমবক্স যোগ করবে। আগেরটাও করবে আবার নতুন টাইমবক্সটাও টানা পাঁচ দিন করার মিশনে নামবে। নতুন এই টাইমবক্সের নাম দিল ম্যাথ টাইমবক্স। কারণ এই টাইমবক্সে সে ম্যাথ করবে। আর আগেরটায় অন্য সাবজেক্ট পড়বে।

এইভাবে একটা একটা করে টাইমবক্স যোগ করার মানেই হচ্ছে রুটিনের একটা অংশ লাইফস্টাইলের মধ্যে যোগ করা। একটু একটু করে এইটা করতে পারলেই লাইফস্টাইল ইফেক্টিভ হয়ে উঠবে। একটা সফট ডিসিপ্লিনের মধ্যে চলে আসবে। আবার সঙ্গে সঙ্গে একটা রুটিনও দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর চাইলে এক ঘণ্টার জায়াগায় দুই বা তিন ঘণ্টার টাইমবক্সও পালন করার এটেম্পট নিতে পারবে সে।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

পাস দাও মা ভিক্ষা, তিন মাস পর পরীক্ষা

আগে নুয়াজ ক্লাসটেস্টে ৩-৪ পাইত। মাঝেমধ্যে ০-ও পাইত। আর এই সেমিস্টার থেকে টাইমবক্স করে ডেইলি ডেইলি পড়ার কারণে সে টেস্টে ২০-এর মধ্যে ১০-১২ পাওয়া শুরু করছে। তার এই চেইঞ্জ দেখে নুয়াজের ক্লাসমেট নোমান আসছে তার সঙ্গে দেখা করতে। এসেই বলছে—দোস্ত, তুই কি বাত্তি জ্বালাইছস। সব ক্লাসটেস্টেই দেখি ফাটায়া দিচ্ছস। তোর এই চেইঞ্জের গোপন রহস্য কী?

আরে, রহস্যটহস্য কিছু নাই। লাস্ট সেমিস্টারের রেজাল্ট খারাপ হওয়ার পর কয়েকবার সোহান ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু সাজেশন নিছি। সোহান ভাইকে চিনস তো? ওই যে ফাইনাল ইয়ারের থার্ড বয়। ওনার টিপসগুলো অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করছি। নিজে নিজেও কিছু বুদ্ধি বের করছি।

—তুই তো শালা লাইন ধরে ফেলছস। আমার কী হবে? পুরাই ফেল করব। তিন মাস পর পরীক্ষা। পুরা সেমিস্টার তো ভেরেন্ডা ভাজি করে কাটাইছি। এখন পরীক্ষার হলে কী ভাজব? যে সময় আছে তার মধ্যে সবকিছু পড়ে শেষ করা সম্ভব? এই সময়ের মধ্যে পুরা জিনিসটাকে কি সিস্টেমে নিয়ে আনা সম্ভব?

শুন, অসম্ভবকে সম্ভব করা অনন্তের কাজ। আর তোর কাজ হচ্ছে যে সময় আছে, সেই সময়গুলোকে ১০০ ভাগ কাজে লাগানো। তাইলে তুই শুধু পাস না; বরং ৩ দশমিক ৫-এর বেশি পাবি। আমি অনেকগুলো টিপস বলতেছি। তোর যেটা যেটা ভালো মনে হয়, সেটা আজকে থেকে অ্যাপ্লাই করা শুরু করে দিবি।

১. সব টেনশনকে বাক্সবন্দি

হতে পারে নিজের ভুলে, হতে পারে অন্য কারও ফান্দে পড়ে, এত দিন ঠিকমতো পড়ালেখা করস নাই। তবে যে কারণেই হোক না কেন, যার দোষেই হোক না কেন, সেটা নিয়ে আফসোস করা যাবে না। কাউকে দোষ দেওয়া যাবে না। কারণ আফসোস, আক্ষেপ, টেনশনের পরিমাণ নিয়ে পরীক্ষায় কোনো প্রশ্ন আসবে না। আর তোর আফসোস করার খুব বেশি খায়েশ হলে ডেইলি ১ ঘণ্টা মনের মাধুরী মিশিয়ে টেনশন করবি। বিকাল ৫.০০ থেকে ৬.০০। তারপর সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে টেনশনের চ্যাপ্টার ক্লোজ।

২. প্রিপারেশন প্রোকাস্টিনেশন

কোনো পরীক্ষা সামনে চলে এলেই পোলাপান প্রথম চার দিন ঢিলামি করে প্ল্যান বানাব, রুটিন বানাব বলে। তার পরের চার দিন নষ্ট করে বন্ধুদের কাছ থেকে বইখাতা, নোটপত্র, সিলেবাস, সাজেশন জোগাড় করতে, রুম গোছাইতে; তবে আজকের পর থেকে বইখাতা থাকুক বা না থাকুক, আজকেই তোকে শুরু করে দিতে হবে। আজকেই পড়তে হবে এবং সেটা আগামীকাল কন্টিনিউ রাখতে হবে।

৩. হাঁটি হাঁটি পা পা, শুরু করে কাঁপা

অনেক দিন গ্যাপ হয়ে যাওয়ার পর প্রথম প্রথম পড়তে মজা না-ও লাগতে পারে। সে ক্ষেত্রে ২০ মিনিট টার্গেট নিয়ে শুরু করে দিবি। তারপর কোনো রকমে ২০ মিনিট পড়ে ফেলতে পারলে ৫ মিনিটের গ্যাপ নিয়ে ৩০ মিনিট পড়ার টার্গেট নিবি। ৩০ মিনিট শেষ করার পর ৪০ বা ৫০ মিনিট টার্গেট নিয়ে বসবি। এইভাবে একটু একটু করে তোর এবিলিটিকে বাড়ায় নেওয়ার চেষ্টা করলে একসময় দেখবি তুই লাইনে চলে আসছস।

৪. অ্যানালগ গ্যাপ

অনেকক্ষণ পড়ার সময় যখন গ্যাপ নিবি, সেই গ্যাপ অবশ্যই হতে হবে অ্যানালগ গ্যাপ। তখন ডিজিটাল কোনো ডিভাইস ধরা যাবে না। কারণ এক মিনিটের কথা বলে মোবাইল বা ল্যাপটপ ধরলে পরের দেড় ঘণ্টার জন্য গদাইলস্কর হয়ে যাবি।

৫. ফার্মের মুরগি

সারা বছর অনেক সোশ্যাল ছিলি। অনেক বিয়ের দাওয়াত, বার্থডে পার্টিতে গেছস। এখন কিছুদিন এই সামাজিকতা বন্ধ রেখে ফার্মের মুরগি হয়ে যা। ফেসবুক, মেসেঞ্জারের চ্যাটিংনির্ভর রিলেশনকে টা-টা বাই বাই কর। আবেগের কাতুকুতু লাগলে প্রেমের ঘাটুরঘুটুর ১ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করবি। তারপরেও প্রিয়জন খুব বেশি প্রেসার দিলে তাকে কিছুদিনের জন্য এক্স বানায় রাখবি। পরীক্ষার পরে থাকলে থাকবে, না থাকলে নাই।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

৬. আউটলাইন

কখনোই স্প্যাসিফিক রুটিন বানাবি না। কখনোই সেট করবি না যে ২১তম দিন আমি এইটা পড়ব। ৩৭তম দিন ওই জায়গায় বাথরুম করব। আমি ছাড়া দুনিয়ার স্বাভাবিক কোনো মানুষ এত একজাক্টভাবে ফলো করতে পারবে না। তুইও পারবি না। তাই তুই যেটা বানাবি সেটা হচ্ছে, আউটলাইন।

পরীক্ষার যেহেতু ৩ মাস বাকি, সেহেতু তুই পরীক্ষার আগের সাত দিন বাদ দিয়ে বাকি সব দিনের আউটলাইন বানাবি। কখনোই টানা সাত দিনের আউটলাইন বানাবি না। কারণ তুই মানুষ, রোবট না। টানা সাত দিন একই সিস্টেমে কাজ করতে পারবি না; বরং প্রতি ছয় দিন পর এক দিন গ্যাপ রাখবি। সেদিন রিলাক্স মুডে থাকবি। কোনো কিছু বাকি থাকলে সেটা রিভিশন দিবি।

৭. মিক্সম্যাচ স্টাইল

কখনোই সবচেয়ে কঠিন সাবজেক্ট দিয়ে শুরু করবি না; বরং সহজ দুইটা সাবজেক্ট প্রথমে রাখবি। যাতে তুই একটা ফিলিংস পাস যে এই দুইটা সাবজেক্ট খতম। যদি টার্গেট সময়ের মধ্যে কোনো সাবজেক্ট শেষ না হয়, তাহলে সেটা বাদ দিয়ে পরেরটা ধরা শুরু করবি। আবার সবকিছু যে বইয়ের প্রথম থেকেই শুরু করতে হবে এমন কোনো কথা নাই; বরং কোনো কোনো সাবজেক্ট পেছন দিক থেকে শুরু করবি। কোনো কোনো সাবজেক্ট বিজোড় চ্যাপ্টার দিয়ে শুরু করবি। আবার কোনো সাবজেক্টের ইম্পরট্যান্ট চাপ্টারগুলো আগে পড়বি। এইভাবে মিক্সম্যাচ করলে বোরড হবি না।

৮. ডাইনামিক টার্গেট

ঘণ্টা হিসেবে নয়, টার্গেট হিসেবে পড়বি। আজকে ছয় ঘণ্টা পড়ব চিন্তা না করে, চিন্তা করবি যতক্ষণ লাগুক না কেন আজকে এই এই চ্যাপ্টার শেষ করব। তোর মাথার মধ্যে একটা আউটলাইন থাকবে যে সকালে এইটা করব। বিকালে এইটা করব। রাতের মধ্যে এইটা শেষ করব। যদি কোনো কারণে সেটা রাতের মধ্যে শেষ না হয় তাহলে সেটা পরের দিন শেষ করে ফেলবি। এইভাবে ডাইনামিক টার্গেট থাকলে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়ার মানসিকতা রাখলে তোর সামনে আগানো সহজ হবে।

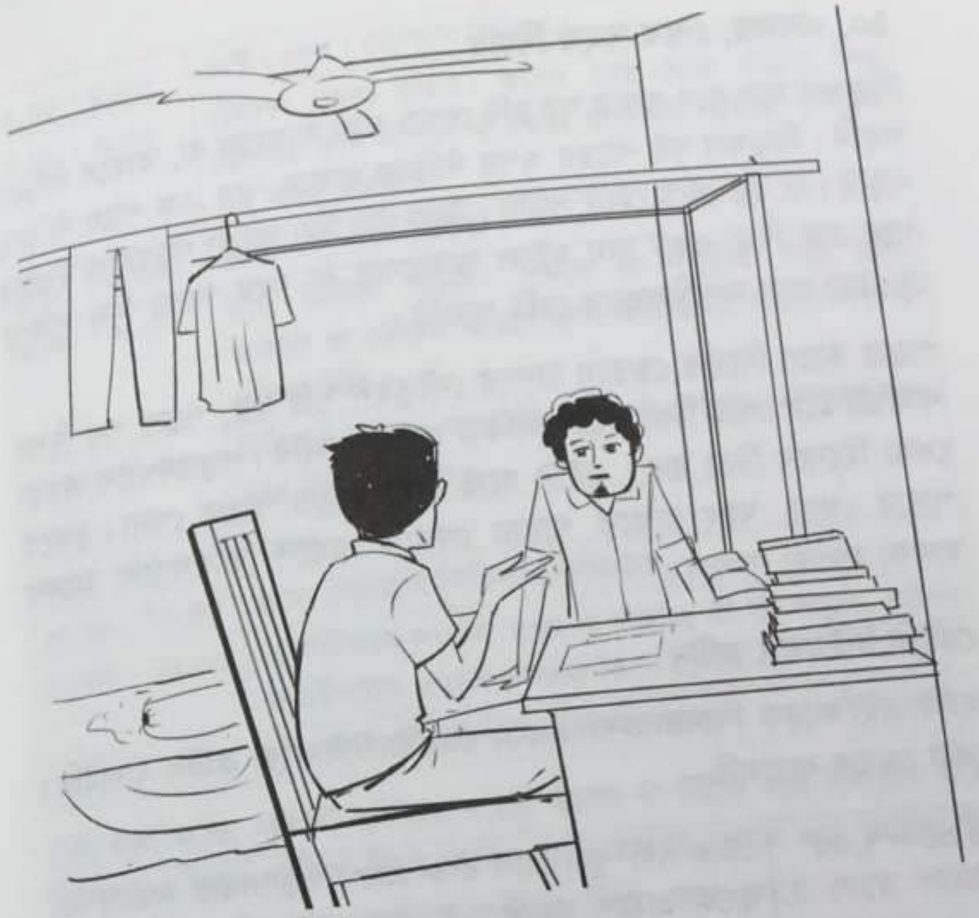

৯. আগে বাপ, পরে লাফ

কখনোই গোসল করে বা ভাত খেয়ে পড়তে বসব চিন্তা করবি না; বরং চিন্তা করবি এইটা পড়া শেষ করেই গোসল করব। এইটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়া উল্টে যেতে পারে আমি গোসল করব না। পড়া শেষ না করা পর্যন্ত ক্ষুধায় মারা যেতে পারি মাগার ভাত খেতে যাব না।

ঘুম থেকে উঠে, দাঁত ব্রাশ করে নাশতা খাওয়ার পরেই যে পড়তে বসা যাবে, এমন কোনো কথা নাই। মাঝেমধ্যে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই পড়া শুরু করে দিবি। এক ঘণ্টা পড়ে, দাঁত ব্রাশ করতে যাবি। আরও এক ঘণ্টা পড়ে নাশতা করতে যাবি। একইভাবে 'বাইরে থেকে এসে জামা কাপড় খুলে, ঘাম শুকানোর আগে পড়া যাবে না'—এমন কোনো আইন নাই। তাই ক্লাস, ল্যাব বা বাইরে থেকে এসে ডাইরেক্ট পড়তে বসে যাবি। পড়তে পড়তেই ঘাম আপনা আপনি শুকিয়ে যাবে।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

১০. এনজয়, দেবে সহজ বিজয়

কিছুক্ষণ বসে বসে পড়ার পর যদি দেখস পড়া আগাচ্ছে না, তাহলে দাঁড়িয়ে পড়বি। কিছুক্ষণ দুই পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার পরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে পড়বি। না হয় হেঁটে হেঁটে পড়বি। টানা পাঁচ দিন ভালো পড়ালেখা হওয়ার পরে এক দিন একটু কম হইলে আফসোস না করে পরের দিন পুষিয়ে দেওয়ার জন্য মানুষিকভাবে রেডি থাকবি।

পড়ার আগে নিজের ভেতরে জানার কৌতুহল সৃষ্টি কর, পড়ার পর মিশন কমপ্লিট হয়ে গেছে চিন্তা করে পুলকিত অনুভব করবি। পড়ালেখাকে একটা খেলা হিসেবে চিন্তা কর। এইটা হচ্ছে শেষ করতে পারার খেলা। বুঝতে পারার খেলা, মনে রাখতে পারার খেলা। তাহলে জিনিসগুলো অনেক হালকা হালকা লাগবে।

ডেইলি টাইমবক্স রুটিন

আমি এই কয়েক দিনের জন্য একটা ডেইলি টাইমবক্স রুটিন বানাইছি। সেটা তোকে বলতেছি—

৬.০০ - ৭.০০	তোর যদি খুব বেশি রাত জেগে পড়ালেখার অভ্যাস না থাকে তাহলে সকাল ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে যাবি
৭.০০ - ৮.৩০	দেড় ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে পড়বি।
৮.৩০ - ৯.০০	সকালের নাশতা
৯.০০ - ১২.০০	ক্লাস, কোচিং, প্র্যাকটিক্যাল না থাকলে বাথরুমে যাওয়া ছাড়া দুপুর ১২টা আগে রুম থেকে বের হওয়া যাবে না। কোনো একটা জিনিস নিয়ে একটানা ৫০ মিনিট পড়ার টার্গেট নিয়ে পড়া শুরু করবি। শেষ না হলে আরেকটু বেশি সময় নিয়ে হলেও টার্গেট শেষ করবি। তারপর ১০ মিনিটের অ্যানালগ ব্রেক।
১২.০০ - ১.৩০	গোসল, খাওয়াদাওয়া, রেস্ট। মেসেজের রিপ্লাই।
১.৩০ - ৪.৩০	দুপুরে ক্লাস, কোচিং না থাকলে সকালের মতো ৫০ মিনিট টার্গেট নিয়ে পড়বি। রিভাইজ দিবি। রাত জেগে পড়ার অভ্যাস না থাকলে কোনো অবস্থাতেই দুপুরে ঘুমাতে যাবি না।

৪.৩০ - ৫.০০	রেস্ট। ব্রেক। সোশ্যাল মিডিয়া।
৫.০০ - ৬.০০	টেনশন করার টাইম। কারও কাছ থেকে কোনো কিছু জোগাড় করা লাগলে বা ফোন কল করা লাগলে, সেগুলো এই সময় করবি।
৬.০০ - ৬.৩০	রেস্ট। সোশ্যাল মিডিয়া।
৬.৩০ - ৮.৩০	ইজি স্টাইলে পড়বি। সকাল বা দুপুরের পড়া বাকি থাকলে বা কোনো কারণে শেষ করতে না পারলে সন্ধ্যায় পুষিয়ে দিবি।
৮.৩০ - ৯.৩০	রিভিশন টাইম। সারা দিনে যা যা পড়ছস, সেগুলো ধরে ধরে রিভিশন দিবি।
৯.৩০ - ১০.০০	ডিনার
১০.০০ - ১০.৪৫	প্রেম, সোশ্যাল মিডিয়ায় গ্যাজানো।
১০.৪৫ - ১১.০০	আগামীকাল সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় কী কী পড়বি, সেটার আউটলাইন একটা কাগজে লিখে রাখবি।
১১.০০ - ৬.৩০	ঘুম। বিদায় পিতিবি। প্রতিদিন কমপক্ষে ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমাবি।

শেষ কথা হচ্ছে, তুই-ই দুনিয়ার প্রথম মানুষ না যাকে অল্প সময়ের মধ্যে প্রিপারেশন নিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। সো, অন্যরা যেমন অল্প কয়েক দিন সময়ের মধ্যে প্রিপারেশন নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে পার পেয়ে যেতে পারছে, তুইও পারবি। জাস্ট শুরু করে দে। চাপ নেওয়ার কিছু নাই।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

টাইমবক্স রকস ক্লিনিক

পরের পাতায় পুরা সপ্তাহের একটা ক্যালেন্ডার দেওয়া আছে। আর বামপাশে দেওয়া আছে সময়। তার মানে পুরা এক সপ্তাহের সকাল ৭টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত দেওয়া আছে। এখন তোর কাজ হচ্ছে প্রতিদিন একটা করে সপ্তাহের সাত দিনে সাতটা টাইমবক্স সেট করা। সেটা একেক দিন একেক সময়ে হতে পারে। পরের পাতায় ক্যালেন্ডারের নিচে একটা মার্ক দেওয়া আছে। সেটার মতো করে মার্ক করবি। তবে শুধু টাইমবক্স সেট করলেই হবে না; বরং আজ থেকে প্রতিদিন এই টাইমবক্সগুলো পালন করবি। যেদিন যেদিন পালন করবি, সেদিন টাইমবক্সের মধ্যে একটা টিক চিহ্ন দিবি। তারপর একটানা সাত দিন করতে পারলে সেটার ছবি তুলে ফেসবুকে শেয়ার করে Jhankar Mahbub-কে ট্যাগ করে দিবি।

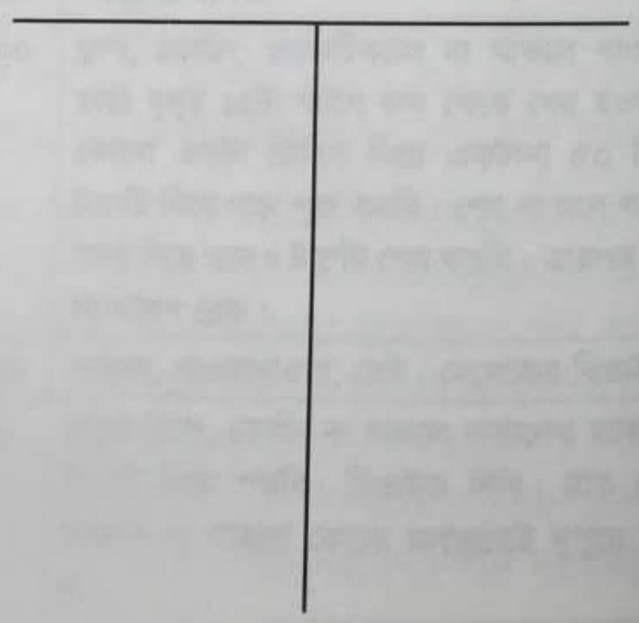

	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি
৭-৮							
৮-৯							
৯-১০							
১০-১১							
১১-১২							
১২-১							
১-২							
২-৩							
৩-৪							
৪-৫							
৫-৬							
৬-৭							
৭-৮							
৮-৯							
৯-১০							
১০-১১							
১১-১২							

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

অপরিচিতদের সঙ্গে কথা না বলার ধানাই-পানাই

ডিপার্টমেন্ট থেকে বের হচ্ছিল নুয়াজ। সামনেই দেখে সোহান ভাই আর ওনার অলরাউন্ডার গার্লফ্রেন্ড সোমা আপু। নুয়াজকে সামনে পেয়েই কপোত করে ধরে ফেলছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সোমা আপু বলে উঠল—

এই নুয়াজ, তোকেই খুঁজছে বাংলাদেশ। না পাইলে, এই জাতি শেষ।

— কেন আপু, সোহান ভাই থাকতে আমাকে খুঁজবে কেন?

আরে কদিন পর ডিপার্টমেন্টে নবীনবরণ হবে। সেখানে ডিপার্টমেন্টের অ্যালামনাইদের দাওয়াত দিতে হবে। স্পনসর জোগাড় করতে হবে। তাই সোহান আর আমি মিলে মুরগি ধরতেছি, মানে ভলান্টিয়ার খুঁজতেছি।

— কিন্তু আপু, আমি তো অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারি না।

(সোমা আপু হাসতে হাসতে বলল)

— তাইলে আগে পরিচিত হয়ে নিবি। তারপর পরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলবি। আসলে সমস্যা অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে না; বরং সমস্যা হচ্ছে পরিচিত কিন্তু ক্লোজ না এমন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে।

— না মানে। কী বলব, সেটাই তো জানি না।

আরে চাপ নেওয়ার কিছু নাই। সোহান আর আমি বলে দেব। কী বলা লাগবে। আর শুন—

অপরিচিত মানুষের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং করার, খাতির জমানোর সাধারণ কিছু ট্রিকস বলে দিচ্ছি। যেগুলো তোদের ফিউচারে সব সময় কাজে লাগবে—

Make Others Talk

অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলার সবচেয়ে সহজ টেকনিক হচ্ছে তুই নিজে এমন কিছু একটা করবি, যেটাতে তুই অনেক অনেক ভালো হবি এবং তোর কাছে হেল্প চাওয়ার জন্য অন্যরা আসবে। তাহলে তোর আর কষ্ট করে, নিজের ভয় ভাঙিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে যাওয়া লাগবে না।

যেমন ধর, তুই চাস তোর ক্লাসের কিছু পোলাপানের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে। সে জন্য তুই ফটোগ্রাফি রিলেটেড কয়েকটা ভিডিও দেখে ফেললি। কয়েকটা ছবি সেই সিস্টেমে তুলে ফেললি। তারপর ছবিতে

কারিশমা লাগানোর জন্য আরও কয়েকটা ফটোশপ টেকনিকের ভিডিও দেখে ট্রাই মারলি। ব্যস, তোকে আর পায় কে। এখন কয়েকটা ছবি তুলে পোস্ট দিলেই দেখবি যারা এত দিন তোকে দেখেও না দেখার ভান করত, তারাই প্রোফাইল পিকচার তুলে দেওয়ার জন্য তোর পেছনে ঘুরতেছে। একইভাবে পোস্টার ডিজাইন করতে পারলে, ভিডিও বানাতে পারলে কিংবা কোনো ইভেন্ট অর্গানাইজ করতে পারলে পোলাপানই তোর কাছে আসবে।

Minimal Talking Kit

তারপরেও যদি অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলা লাগে, তাহলে সব সময় তোর পকেটে চারটা প্রশ্ন রেডি রাখবি—প্রথমে হ্যান্ডশেক করে, 'আমি নুয়াজ।' (তাহলে প্রত্যুত্তরে সে তার নাম বলবে)। তারপর তুই তোর গৎবাঁধা প্রশ্ন করবি, 'আপনি কী করেন, কোথায় জব করেন?' এরপর সে দু-একটা প্রশ্ন করলে তুই সেটার উত্তর দিবি। ব্যস, তোর অপরিচিত একজনের সঙ্গে কথা বলা হয়ে গেল।

Talk with Strangers

তুই যদি আরও সিরিয়াস হতে চাস। তাহলে ঠিক করে নিবি প্রতিদিন ১০ জন অপরিচিত মানুষকে Hi বলবি। জিজ্ঞেস করবি, ভাই কেমন আছেন? দিনকাল কেমন যাচ্ছে? এ রকম যদি ১০ জনকে জিজ্ঞেস করস, তার মধ্যে পাঁচজন হয়তো উত্তর দেবে। দুজন কিছু বলবে না। আর তিনজন উল্টো দিকে দৌড় দেবে। তবে যে যে-ই রিপ্লাই দিক না কেন, তোর কাজ হচ্ছে অপরিচিত কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারাটা। তুই জিজ্ঞেস করতে পারছস। ব্যস, তোর কাজ হয়ে গেছে।

Be Part of an Organization

অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলার আরেকটা ভালো উপায় হচ্ছে কোনো অর্গানাইজেশনে যোগ দেওয়া। তোর কিচ্ছু করা লাগবে না। জাস্ট ঠিক সময়ের ১০ মিনিট আগে হাজির হবি। যারা অর্গানাইজ করে, তারাই এসে তোর সঙ্গে কথা বলবে। ব্যস, একজন অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা হয়ে গেল। আর মাঝেমধ্যে অল্প দরকার হলেও ডিপার্টমেন্টের টিচারদের সঙ্গে দেখা করতে চলে যাবি কিংবা সিনিয়র ভাইয়া-আপুদের কাছে হেল্প চাইবি।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

Bring a Friend

কোথাও প্রথম প্রথম একা একা যেতে আনইজি বা ভয় লাগলে একজন ফ্রেন্ডকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবি। তাহলে অপরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলতে সাহস বেড়ে যাবে। আর শেষমেশ কারও সঙ্গে কথা বলতে না পারলেও তোরা নিজেরা নিজেরা কথা বলে টাইম পাস করতে পারবি।

Stage Volunteer

বেশি মানুষের সামনে দাঁড়াতে ভয় লাগলে কোনো একটা ইভেন্টে স্টেজের ভলান্টিয়ার হিসেবে থাকবি। তারপর কখনো স্টেজ থেকে চেয়ার-টেবিল সরানো লাগলে বা মাইক চেইঞ্জ করা লাগলে তোকে স্টেজে যেতে হবে। সেই ফাঁকে আড়চোখে দর্শকদের দিকে একটু তাকিয়ে ফেলবি। তাহলে দর্শকদের দৃষ্টি কেমন হয়, সেটা একটু একটু করে তোর প্র্যাকটিস হয়ে যাবে।

Expect to be Nervous

দুনিয়ার এমন কোনো মানুষ নাই যে অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে কখনো নার্ভাস হয় নাই। তাই তোরও ভয় লাগবে, নার্ভাস লাগবে, আনইজি লাগবে। এটাই নরমাল। তাই এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই। জাস্ট কী বলা লাগবে, সেটা আগে থেকে মুখস্থ করে যাবি। তারপর সামনে গিয়ে গড়গড় করে বলে দিবি। ব্যস, কাজ শেষ।

তা ছাড়া এক দিনে তুই নেটওয়ার্কিংয়ে বস হয়ে যাবি না। প্রথম প্রথম তোতলামি করবি। ভুল করবি। যেটা বলা উচিত ছিল, সেটা ভুলে যাবি। দুই-একবার লজ্জায় পড়বি। পরেরবার আবার সেই ভুলগুলো না করার চেষ্টা করবি। তাহলে করতে করতে একসময় জিনিসগুলো তোর জন্য ডালভাত হয়ে যাবে। তত দিন পর্যন্ত একটা ভাব ধরবি যে তুই কনফিডেন্ট।

তুই কীভাবে কথা বলতেছস, সেটা কেউ ভিডিও করছে না। আজ থেকে ছয় মাস পর কেউ মনেও রাখবে না। সো, টেনশন নেওয়ার কিছু নাই। জাস্ট হালকা একটু সাহস নিয়ে অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দে। কী আছে গেবনে?

ইন্ট্রোভার্ট হয়েই, চামে কোপ মারে রাম কানাই

কথা বলতে বলতে সোমা আপু বলতে থাকে, পোলাপানের আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, তারা নাকি ইন্ট্রোভার্ট। আরে—

আইনস্টাইনের নাম শুনছস তোরা? সে কিন্তু ইন্ট্রোভার্ট ছিল। শুধু আইনস্টাইন না; বরং মার্ক জাকারবার্গ, ওয়ারেন বাফেট, বিল গেটস, মহাত্মা গান্ধী—এরা সবাই তাদের জীবনে বিশাল বিশাল কাজ করতে সক্ষম হলেও সবাই কিন্তু ইন্ট্রোভার্ট। আমরা যতই Steve Jobs নিয়ে লাফালাফি করি না কেন, Apple কোম্পানির শুরুর দিকে কম্পিউটার বানানোর মূল ভিত্তি দাঁড়া করেছিল ইন্ট্রোভার্ট কো-ফাউন্ডার Steve Wozniak। তিনি বলেছেন, Most inventors and engineers I've met are like me. They're shy and they live in their heads.

সো, তোর যদি অপরিচিত কারও সামনে কথা বলতে ভয় লাগে, হাঁটু কাঁপে, পাবলিক স্পিকিংয়ের কথা শুনলে একটু-আধটু প্যান্ট ভিজে যায়, এতে টেনশন করার কিছু নাই। কারণ তুই দুনিয়ার একমাত্র ইন্ট্রোভার্ট না। ইনফ্যাক্ট, প্রতি তিনজন মানুষের মধ্যে একজন ইন্ট্রোভার্ট।

তুই যদি তোর ক্লাসের দিকে খেয়াল করস তোদের ব্যাচে যেমন ইন্ট্রোভার্ট আছে। আমাদের ব্যাচেও ইন্ট্রোভার্ট আছে। আমাদের ওপরের ব্যাচেও ইন্ট্রোভার্ট ছিল। তার ওপরের ব্যাচেও ইন্ট্রোভার্ট ছিল। সেই ইন্ট্রোভার্ট ভাইয়া-আপুরা ঠিকই পার পেয়ে গেছে। ইন্ট্রোভার্ট হয়েও ঠিকই জব করে ক্যারিয়ার ভালোভাবে এগিয়ে নিচ্ছে। তারা ইন্ট্রোভার্ট হয়ে পারলে তুইও ইন্ট্রোভার্ট হয়ে ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে পারবি।

বরং ইন্ট্রোভার্ট হওয়ার অনেক লাভ আছে। একটানা লম্বা সময় একটা জিনিস নিয়ে পড়ে থাকতে পারা যায়। ফোকাস রাখা যায়। সলিড অনেক কিছু ডেভেলপ করে ফেলা যায়।

তা ছাড়া এক্সট্রোভার্ট হতে পারলেই যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা কিন্তু না; বরং এক্সট্রোভার্টরাও ভালো কিছু করতে চাইলে তাদের কিছুদিন ইন্ট্রোভার্টদের মতো চোখের আড়াল হয়ে নলেজ, স্কিল ডেভেলপ করতে হয়। তারপর সব রেডি হলে বক বক করে বকেশ্বর হয়ে যায়। অন্যদিকে ইন্ট্রোভার্টরা খুব সহজেই কোনো কিছুর পেছনে লম্বা সময় ধরে লেগে থেকে

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

বড় কিছু দাঁড়া করায় ফেলতে পারে। তারপর দাঁত খিঁচিয়ে ১০ মিনিটে সামারি প্রেজেন্ট করতে পারলেই কাজ শেষ। সে জন্যই ইদানীং অনেক করপোরেটের বড় পদে ইন্ট্রোভার্ট লিডার বা ম্যানেজার হায়ার করে। কারণ ইন্ট্রোভার্টরা ফিনিশার।

মেইন কথা হচ্ছে, তুই এক্সট্রোভার্ট, ইন্ট্রোভার্ট বা আলিয়া ভাট যেটাই হোস না কেন, তোর দরকার হচ্ছে যেটা করা দরকার, সেটা সিরিয়াসলি করা। সেটা করতে পারলে ইন্ট্রোভার্টগিরির জন্য তোর ফিউচার কোনো দিনও আটকে থাকবে না।

আম ছাড়া আচার, প্যাশন ছাড়া ফিউচার

আবার অনেকেই প্যাশন নিয়ে কথা বলে। প্যাশন থাকতে হবে। লোশন মাখতে হবে। বাগেরা বাগেরা।

তখন পাশে থেকে একজন জিজ্ঞেস করছে।

— আপু, প্যাশন কী জিনিস। এটা কি খায় পিন্দে, না মাথায় দেয়?

তখন সোমা আপু বলতে শুরু করে—

প্যাশন হচ্ছে এমন একটা কাজ, যেটা করতে তোর ভালো লাগে। যে কাজটা একবার শুরু করলে, এক ঘণ্টার জায়গায় দুই-চার ঘণ্টা পড়ে থাকলেও তুই বোরড হোস না, সেটাই তোর প্যাশন।

কারও প্যাশন হতে পারে গান গাওয়া। সে গাইতে পারুক বা না পারুক, মন ভালো থাকুক বা খারাপ থাকুক, সে গান নিয়ে পড়ে থাকে। কাজের ফাঁকে, ক্লাসের গ্যাপে, ছুটির দিনে টুং টাং করে বাজাতে বাজাতে গান গাইতে থাকে। আরেকজনের প্যাশন হতে পারে প্রোগ্রামিং। দরকার লাগুক বা না লাগুক, সে চান্স পাইলেই প্রোগ্রামিং নিয়ে বসে পড়ে। কবে কোথায় প্রোগ্রামিং কনটেস্ট হবে, সেটা সে খুঁজে বের করে। তার সঙ্গে কেউ থাকুক বা না থাকুক, সে নিজে নিজেই চলে যায়।

শুন, প্যাশন তিন প্রকার। প্রথমটা হচ্ছে চুলকানি-মার্কা প্যাশন। এই টাইপের প্যাশন যাদের হয়, তারা আজকে যেটাকে প্যাশন বলতেছে, দুই মাস পরে অন্য আরেকটাকে তাদের প্যাশন বলবে। কারণ এরা হুজুগে বাঙালি। নতুন কিছু দেখলে সেটা নিয়ে দুদিন লাফাবে, তিন দিন পরে ছেড়ে দেবে। এদের প্যাশনের গভীরতা নাই। আজ আছে কাল নাই-টাইপের অবস্থা। তবে সত্যিকারের প্যাশন হচ্ছে বিখাউজ-মার্কা প্যাশন। যেটা ছয় মাস, এক বছরেও চেইঞ্জ হয় না। অন্ধ প্রেমের মতো। ফ্যামিলি বাধা দিক, না করুক, কিচ্ছু যায়-আসে না। তারা এইটার পেছনে লেগে থাকবেই। প্যাশন তাদের কাছে এক প্রকারের অবসেশন।

আর তৃতীয় টাইপের প্যাশন হচ্ছে, টেম্পোরারি ব্যান্ডএইড প্যাশন। এরা পেটের দায়ে সাংবাদিকতা করবে, অ্যাড ফার্মে চাকরি করবে, শিক্ষকতা করবে। আর ছুটির দিনে সিরিয়াসলি গান করবে, ছবি আঁকবে, কবিতা

লিখবে। যত দিন সিঙ্গেল থাকবে, তত দিন টুকটাক করে চালাতে থাকবে। তারপর একসময় বিয়ে করে বাচ্চাকাচ্চা হলে গিটারটা আলমারিতে তুলে রাখবে। রং-পেনসিলগুলোতে ধুলাবালি জমবে। এই ব্যান্ডএইড প্যাশন থাকা খারাপ কিছু না। এইটাও লাইফের একটা সিস্টেম। সবাই সব সময় একই সিস্টেমে লাইফ চালিয়ে নিতে পারবে না। কেউ বাস্তবতা থেকে পালিয়ে যাবে। কেউ বাস্তবতাকে বশে আনবে। আবার কেউ বাস্তবতার সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করবে।

প্যাশন রিলেটেড ক্যারিয়ার হতে পারলে ভালো। তাইলে কাজ করতে মজা পাওয়া যাবে। তবে ক্যারিয়ার যে প্যাশন রিলেটেড হতেই হবে এমন কোনো কথা নাই।

—আপু, আমার প্যাশন কী। সেটা কীভাবে বুঝব?

এখন তোর যদি মনে হয়। আপু, আমার তো কোনো প্যাশন নাই। আমি কী করব? তাইলে তুই এই তিনটা কাজ করতে পারস।

ফাইন্ড ইউর প্যাশন (Passion from Past)

পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে তোর পেছনের তিন মাস স্ক্যান কর। চিন্তা করে দেখ। এমন কোনো কিছু আছে, যেটা করতে তোর ভালো লাগে। যেটা এনজয় করস বা তুই করতে চাস। করার পর নিজের ভেতরে শান্তি শান্তি লাগে। কেউ কোনো টাকা না দিলেও তুই ঘণ্টার পর ঘণ্টা করে যেতে পারস। এমন কিছু হতে পারে ছবি আঁকা, গান গাওয়া, প্রোগ্রামিং, গল্প-কবিতা লেখা, ইভেন্ট অর্গানাইজ করা, কমেডি, ঘুরতে যাওয়া, এমনকি সিরিয়াসলি পড়ালেখা করাটাও মানুষের প্যাশন হতে পারে।

ক্রিয়েট ইওর প্যাশন (Passion from Future)

তোর যদি প্যাশন না থাকে, তাহলে চিন্তা কর তুই কী হতে চাস, কী স্বপ্ন দেখস। সেটাও যদি ঠিক করতে না পারস, তাহলে আশপাশের ফ্রেন্ড, সিনিয়র ভাইয়া-আপুদের বা বাইরের দুনিয়ার মানুষদের দেখ। তারপর ঠিক কর তাদের ভেতর থেকে তুই কার মতো হতে চাস। সে কী কী করে। সেগুলো কুত কুত করে করতে শুরু করে দে। সেগুলোকে জীবনের অংশ বানিয়ে ফেল। তাহলে কিছুদিন পরে সেটাই তোর প্যাশন হয়ে দাঁড়াবে।

গ্রো উইথআউট প্যাশন (Do What You Should Do)

ধর তুই তোর পাস্ট স্ক্যান করে প্যাশন খুঁজে পাইলি না। ফিউচার ইমাজিন করেও প্যাশন দাঁড় করাতে পারলি না। তাহলেই তোর জীবনের আশা-ভরসা, গ্রীষ্ম-বর্ষা, শ্যামলা-ফরসা সব হারিয়ে যাবে? না, যাবে না; বরং তুই শক্ত হয়ে বলবি, প্যাশনের খ্যাতা পুড়ি। আমার যে কাজটা বেশি বেশি করা উচিত, সেটাই আমি বেশি বেশি করে করব।

তাই প্যাশন খুঁজে না পেলে, প্যাশন নিয়ে টেনশন করে লাইফের কন্ডিশন খারাপ করার কোনো মানে হয় না। কারণ বেঁচে থাকতে হলে, টিকে থাকতে হলে, সামনে এগোতে হলে যে প্যাশন থাকতেই হবে এমন দিব্য বাণী কেউ লিখে যায়নি। সো, তুই তোর প্যাশন ঠিক করতে না পারলে, টার্গেট সেট কর। তারপর সেটার জন্য একটু একটু করে কাজ করতে শুরু করে দে।

আর প্যাশন আজীবন যে একই থাকবে এমন কোনো কথা নাই। স্টুডেন্ট লাইফে গান গাওয়া কারও প্যাশন হতে পারে। আবার চাকরিজীবনে গিয়ে

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানো শখ বা প্যাশন হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। মোট কথা হচ্ছে, যখন যেটা করতে ইচ্ছে হবে, সেটা খোলা মনে আগ্রহসহকারে করা শুরু করে দিবি। আট-দশবার করার পর ভালো লাগলে করতে থাকবি। আর ভালো না লাগলে কমিয়ে দিবি। এইভাবেই প্যাশন আসবে-যাবে। জীবন সামনে এগিয়ে যাবে।

ফাইনাল একটা কথা মনে রাখবি, সবাই চাইলেও, ক্লাসে ফার্স্ট হতে পারবে না। তবে সবাই চাইলেই কিছু না কিছুতে খুব ভালো হতে পারবে। তাই তুই যদি খুব ভালো রেজাল্ট না-ও করতে চাস, তাহলে পড়ালেখা কোনো রকমে চালিয়ে যা। এর পাশাপাশি অন্য কিছুতে সিরিয়াস হবি। সেটা তোর প্যাশন রিলেটেড হতে পারে, তোর হবি রিলেটেড হতে পারে বা অন্য কিছু হতে পারে। মোট কথা হচ্ছে তুই কিছু না কিছু জিনিসে সিরিয়াস থাকবি। সেটা পড়ালেখা হোক বা অন্য কিছু হোক। তাহলেই লাইফ নিয়ে টেনশনের কিছু থাকবে না।

লিডার হলেই পয়দা হবে, চিকন পিনের চার্জার

সোমা আপুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সোহান ভাই আরও কয়েকজনকে ধরে নিয়ে আসছে। সবাইকে দাঁড়া করিয়ে সোহান ভাই বলতে শুরু করল—

এই যে আমি তোদের সবাইকে জোগাড় করছি। একসঙ্গে করছি, যাতে তোরা লিডারশিপ ডেভেলপ করার ফার্স্ট ট্রেনিংটা পেয়ে যাস। শুন—

লিডারশিপ—নিজের খেয়ে, বনের মোষ তাড়ানো না; বরং বনের মোষ তাড়াতে গিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট, পিপল ম্যানেজমেন্ট, কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রাকটিক্যাল নেগোসিয়েশন শেখার মিশন। এই বনের মোষ কোনো অর্গানাইজেশনে জয়েন করে তাড়াতে পারস, আবার ক্লাসের ট্যুর, ডিপার্টমেন্টের কোনো ইভেন্ট অর্গানাইজ করেও করতে পারস। এই মোষ তাড়ানো বা লিডার হওয়ার সিম্পল কয়েকটা স্টেপ আছে।

স্টেপ-১ : বি অ্যাভেইলেবল

ল্যাপটপের মায়াজাল, খেলা দেখার নেশা, বাথরুমের চিপা থেকে সময় বের করতে হবে। ক্যাম্পাসে প্রায়ই কালচারাল ইভেন্ট, ক্যারিয়ার ক্লাব, ডিপার্টমেন্টের প্রোগ্রাম, ভলান্টিয়ার অ্যাকটিভিটি হয়। এ রকম একটা বা দুইটা ইভেন্টে যাবি। নির্ধারিত সময়ের ১ ঘণ্টা আগে গিয়ে কোনার মধ্যে লুকিয়ে না থেকে অর্গানাইজাররা যেখানে ছোটাছুটি করতেছে, তার আশপাশে ঘোরাঘুরি করবি। তেমন কিছু বলার দরকার নাই। জাস্ট দেখবি, খেয়াল করবি, অবজার্ভ করবি। কেউ ভারী কিছু একা একা সরাইতে না পারলে একটু হেল্প করবি। ব্যস, এই টুকুই। এর বেশি কিছু না।

স্টেপ-২ : বি হেল্পফুল

অর্গানাইজাররা যখন দেখবে তুই হেল্প করতেছস, তখন তারাই বলবে, রিসেপশনে যে থাকার কথা, সে এখনো আসে নাই। তুই কি ওইখানে একটু বসতে পারবি? কোনো গেস্ট এলে সামনের সারিতে এনে বসাবি বা এই খাবারের প্যাকেটগুলোর সঙ্গে একটা করে ড্রিংকস দিতে পারবি? তখন হাসিমুখে বলবি, অবশ্যই। এই 'অবশ্যই' শব্দটা বলে তুই একটা অর্গানাইজেশনের আনঅফিশিয়াল কমিটি মেম্বার হয়ে গেছস। এইভাবে

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

দুই-তিনটা ইভেন্টে হেল্প করলে, ওরাই তোকে পাবলিক রিলেশন সেক্রেটারি বা ফুড সেক্রেটারি বানায় দেবে। ব্যস, তোর সিভিতে বড় বড় করে লেখার মতো একটা জিনিস পেয়ে গেলি। যারা রুমে বসে বসে ভিডিও গেইম খেলতেছে, তাদের চেয়ে এগিয়ে গেলি।

স্টেপ-৩ : বি এ ফলোয়ার

একটা অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত হলেই সেটার জন্য দিনরাত ২৪ ঘণ্টা লেগে থাকা লাগে না। মাসে ৩-৪ ঘণ্টা বা সেমিস্টারে ১০-১৫ ঘণ্টা সময় দিলেই হয়। তবে তোকে যেসব দায়িত্ব দেবে, সেগুলো সিনসিয়ারলি করবি। যেখানে যেতে বলবে, সেখানে যাবি। সিনিয়ররা যেসব ডিসিশন নিচ্ছে, সেগুলো খেয়াল করবি। তোর কোনো অভিমত থাকলে জানাবি। বি এ গুড ফলোয়ার। গুড লিসেনার। আর কিছু না।

স্টেপ-৪ : বি এ লিডার

তুই যখন থার্ড ইয়ারের শেষ দিকে যাবি, তখনই সিনিয়রদের বিদায় ঘণ্টা বেজে উঠবে। তারা চাইবে তাদের প্রাণপ্রিয় অর্গানাইজেশনটা কোনো একজন ইফেক্টিভ এবং সিনসিয়ার কারও হাতে তুলে দিতে। তুই যেহেতু এত দিন ধরে দায়িত্ব নিয়ে হেল্প করছস, তোকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ দেবে। তারপর থেকে তুই-ই জুনিয়রদের কাজে লাগাবি। ডিসিশন মেক করবি। তুই-ই লিডার হয়ে যাবি।

স্টেপ-৫ : বি ইউর ওউন লিডার

তুই কোনো টিম, কোনো অর্গানাইজেশনের লিডার হতে চাস বা না চাস, তুই তোর লাইফের লিডার। তোর লাইফকে তোকে লিড করতেই হবে। তোর লাইফকে ডিরেকশন তোকে দিতেই হবে। লিডার হওয়ার স্টেপগুলো তোর নিজের লাইফে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সে জন্যই তোর কোনো কিছু করা লাগলে সেটার জন্য তোকে অ্যাভেইলেবল হতে হবে। কোনো কিছু না পারলে সেটা শেখার চেষ্টা করা মানে নিজেই নিজেকে হেল্প করা।

ঠেকায় পড়ে, পোস্টার ডিজাইন, ম্যাগাজিন প্রিন্ট, টি-শার্ট ডিজাইন শিখে ফেলবি। ১০-১৫ জনের একটা টিম চালানোর ট্রেনিং ফ্রি ফ্রি পেয়ে যাবি।

রিলেশন ইনফেকশন ক্লিনিক

কিছুক্ষণ আগে সোহান ভাই আর সোমা আপু অপরিচিত মানুষের সঙ্গে, অর্গানাইজেশনের লোকদের সঙ্গে কথা বলা নিয়ে অনেক কিছু বলছে। এখন দেখ তোর আশপাশের বা অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে তোর কমিউনিকেশন এবং রিলেশন কেমন। সেটা চেক করতে পরের পাতায় রিলেশন ইনফেকশন ক্লিনিকের অনেকগুলো পয়েন্ট দেওয়া আছে। তার বামপাশে একটা করে খালি ঘর দেওয়া আছে। যদি ডানপাশের লেখা মানুষ বা মানুষদের সঙ্গে তোর রিলেশন বা কমিউনিকেশন ভালো হয়, তাহলে খালি ঘরে একটা উজ্জ্বল সূর্য আঁকবি। আর যদি সম্পর্ক খারাপ হয় তাহলে একটা মেঘ আঁকবি। আর যদি মোটামুটি ভালো বা মোটামুটি খারাপ হয় তাহলে মেঘলা সূর্য এঁকে দিবি।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

অপরিচিত কারও সঙ্গে তোর কথা বলার সাহস

মিনিমাম একটা অর্গানাইজেশনের তুই কি রেগুলার মেম্বার

ক্লাসমেটদের বা ডিপার্টমেন্টের টিচারদের সঙ্গে তোর সম্পর্ক

রুমমেট বা (বাসায় থাকলে) ফ্যামিলি লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক

রুমমেট/ক্লাসমেটের বাইরে তোর দুজনের বেশি ফ্রেন্ড আছে

স্পেশাল কেউ থাকলে তার সঙ্গে তোর সম্পর্ক

যদি তোর ৩টা বা তার বেশি উজ্জ্বল সূর্য হয় তাহলে তোর চারপাশের সঙ্গে রিলেশন ভালো আছে। আর যদি তার কম হয় তাহলে মানুষের সঙ্গে তোর ইন্টার‍্যাকশন বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত।

ভয়ের সঙ্গে পাঙ্গা, ফিউচার হবে চাঙ্গা

এই নবীনবরণ ইভেন্টটা হচ্ছে নুয়াজের ভলান্টিয়ার করা প্রথম ইভেন্ট। এই ইভেন্ট শুরুর দেড় ঘন্টা আগেই সে ভেন্যুতে চলে এসেছে। তার দায়িত্ব হচ্ছে স্টেজের পেছনে থাকা। স্টেজে কোনো কিছুর দরকার হলে সেটা দিয়ে আসা।

নুয়াজ কখনোই স্টেজের পেছনে আসেনি। জীবনে কোনো দিন স্টেজে ওঠেনি। তাই অনেক ভয় লাগছে। যদিও তার সঙ্গে আছে রায়হান ভাই। তাই কিছুটা ভয়ের আন্ডা হয়ে নুয়াজ রায়হান ভাইকে জিজ্ঞেস করছে।

— ভাই, স্টেজে যেতে আপনার ভয় লাগে না?

(তখন রায়হান ভাই একটু হেসে বলল)

আরে দূর—

নতুন কোনো কিছু করার দরকার হলেই আমাদের মনের ভেতর খটমট করতে থাকে—মনে হয় আমি পারব না। কী করতে হবে, আমি জানি না। এগুলো আমাকে দিয়ে হবে না। এটা হচ্ছে না পারার ভয়। এটা ছাড়া আরও দুই ক্যাটাগরির ভয় আছে। যার প্রথমটা হচ্ছে, হারানোর ভয়। যেমন ধর, কেউ কেউ আত্মসম্মান হারাতে পারে, প্রেস্টিজ পাংচার হতে পারে, ফ্রেন্ড সার্কেল বা আত্মীয়স্বজনের সামনে লজ্জায় পড়তে পারে, তাই ডিফরেন্ট কিছু ট্রাই করতে চায় না। পয়সা খোয়ানোর চান্স আছে বলে বিজনেসে নামতে চায় না।

আরেক ক্যাটাগরির ভয় হচ্ছে মেন্টাল সাপোর্ট না পাওয়ার ভয়। তাদের যদি ফ্যামিলি মেম্বার কেউ বলে দেয়, যাও, করো। আমি আছি তোর সঙ্গে কিংবা কোনো স্যার এসে যদি বলেন, দাও, পড়া শুরু করে দাও। এই সময়ের মধ্যে পড়েই ভালো করতে পারবে। তাহলে এদের আর ভয় থাকে না।

তবে যে কারণেই ভয় পাস না কেন, আসল কথা হচ্ছে ভয় শুধু তুই একা পাস না; বরং দুনিয়ার সবাই ভয় পায়। দুনিয়ার সব সেরা সেরা অ্যাথলেট, সেলিব্রেটি, সাকসেসফুল মানুষ : সবার কাজের মধ্যে না হওয়ার, না পারার, লজ্জা পাওয়ার চান্স আছে। তাদের ভেতরেও ভয় থাকে। তবে তাদের সঙ্গে আমাদের ডিফারেন্স হচ্ছে তারা ভয় পেলেও একটু একটু করে কাজটা করতে থাকে। কী কী অ্যাকশন নেওয়া যায়, কোন কোন অ্যাঙ্গেলে ট্রাই করা যায়, সেই ডিসিশন নিয়ে চেষ্টা শুরু করে দেয়। তারা কনসার্নড না

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

হয়ে কিউরিয়াস হয়ে ওঠে। কেন হবে না চিন্তা না করে, কীভাবে করা যেতে পারে, সেটা নিয়ে চিন্তা করে। ভয়ের সঙ্গে পাঙ্গা নেয়। আর আমরা ভয় পেয়ে, কাজটা না করে লেজ গুটিয়ে গুজুর গুজুর করতে থাকি।

সো, ভয় পাওয়াটা সমস্যা না। সমস্যা হচ্ছে ভয় পেয়ে কিছু না করা। আর ভয় পাওয়ার পরেও কাজটা চালিয়ে যেতে চাইলে ফিয়ারকে পাওয়ারে কনভার্ট করতে হবে। নিজের ভেতরে স্ট্রেংথ তৈরি করতে হবে। ভয়ের এগিনেস্টে পজিটিভ কথা বলতে হবে। ভয়ের অ্যাঙ্গোলকে কাজের অ্যাঙ্গোলে কনভার্ট করতে হবে। তাই আজকের পর থেকে ফিয়ারকে পাওয়ারে কনভার্ট করবি—

Convert Fear to Power		
আমাকে দিয়ে হবে না	→	এই আমিই করে দেখাব
এত অল্প সময়ের মধ্যে হবে না	→	এত অল্প সময়ের মধ্যেই করে ছাড়ব
জানি না এইটা কীভাবে হবে	→	গুগলে সার্চ দেই, ওমুকের কাছে যাই দেখি এটা কীভাবে করা যায়
আমাকে কেউ হেল্প করে না	→	কেউ হেল্প না করলে, আমি একা একাই করব
আমার উচ্চারণ শুনে সবাই হাসে	→	আজ থেকে বাসায় গিয়ে ওদের উচ্চারণ কপি করা শুরু করলাম
আমি বিন্যাস সমাবেশ পারি না	→	বিন্যাস সমাবেশটা আরেকবার বোঝার চেষ্টা করে দেখি
আমি ইংরেজি বলতে পারি না	→	ডেইলি দুই লাইন করে ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করলাম

মনে রাখবি, জীবনে যত কিছুতে ভয় পাবি। সব ভয় কমানোর একটাই উপায় ভয়কে চ্যালেঞ্জ করা। ভয়ের সঙ্গে কম্পিটিশনে নামা। নিজের সীমাবদ্ধতাগুলো পার্টে পার্টে ভাগ করে একটা একটা করে শিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে আলসেমির জড়তার মরিচা দূর করা। ধর, কেমিস্ট্রি পড়তে ভয় পাচ্ছস? কেমিস্ট্রিকে লাইনে আনতে চাস? এইবার কেমিস্ট্রি প্রথম থেকে শুরু কর। একবার, দুইবার, তিনবার পড়। জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা কর। কাউকে পাইলে তার সঙ্গে ডিসকাস কর। যে জায়গাগুলোতে বুঝস না, সেগুলো দাগিয়ে কোচিং সেন্টারের ভাইয়াদের কাছে বুঝতে যা। ক্লাস শেষে স্যারের

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। ছয় মাস পরে দেখবি, কেমিস্ট্রিই তোর ফেভারিট সাবজেক্ট হয়ে গেছে।

শুন, আমরা যে ভয় পাই, সেটার লজিক্যাল কারণ আছে। আমাদের মন সব সময় চায় ভালো রেজাল্ট করতে। ভালো ইনকাম করতে। স্মার্ট হতে, সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে, সেলিব্রেটি হতে। কিন্তু সেটার জন্য যে লেভেলের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, যে পরিমাণ সাধনা, হার্ডওয়ার্ক করতে হবে, সেই লেভেলের কষ্ট করতে আমাদের মন চায় না। স্ট্রাগলের দিকে শরীর টানে না। শরীর আর মন চায়—চিপাচাপায় গিয়ে আলাদিনের চেরাগ খুঁজে বের করতে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নেপ্রাপ্ত ওষুধ পেতে। কিছু না করেই টপাটপ রসগোল্লা গিলতে।

সো, আজকের পর থেকে কোনো কিছুতে ভয় যত বেশি পাবি, চেষ্টার পরিমাণ তত বেশি বাড়াবি। মনকে জিজ্ঞেস করবি নেক্সট কোন জিনিস নিয়ে ভয় পাচ্ছস? ওকে, আজকে থেকে সেটাই করা শুরু করলাম। এইটার চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে ছাড়ব। এইভাবে ভয়ের সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার মেন্টালিটি গ্রো করতে পারলে, যেটাতে ভয় পাচ্ছিলি, সেটাই তোর গাইডিং কোচ হয়ে যাবে। তোর অ্যাপ্রোচ দেখে ভয় হাফপ্যান্ট খুলে পালাবে।

There is a great difference between worry and concern. A worried person sees a problem, and a concerned person solves a problem. — Harold Stephen

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

প্রেমে স্বৈরাচারী করে, পালিয়ে বাঁচে লাফাঙ্গা

প্রোগ্রামের শুরুতে কয়েকজনের বক্তৃতা শেষে এক একজন করে অ্যালামনাইদের স্টেজে ডাকা হলো। বেশির ভাগ অ্যালামনাই কয়েক লাইন বলে স্টেজ থেকে নেমে আসছে। তারপর কয়েকটা নাচ-গান হওয়ার পর খাওয়াদাওয়া দিয়ে ইভেন্ট শেষ হলো। ইভেন্ট শেষ হওয়ার পর কয়েকজন অ্যালামনাই অর্গানাইজারদের সাথে আড্ডা দিচ্ছে। তাদের মধ্যে আছে ওয়ান পিস, দবির ভাই। সবাই নাকি ওনাকে দই বলে ডাকত।

উনি তার ব্যাচের কে কীভাবে প্রেম করছে, সেই রিলেটেড কিছু মজার ঘটনা বললেন। এক স্যারের প্রেমের ঘটনাও বললেন। যদিও স্যারের নাম বলেননি। তবে সবাই বুঝতে পারছে কোন স্যারের কথা ইঙ্গিত করছেন।

(মাঝখানে একজন প্রশ্ন করল।)

—ভাইয়া, আমরা তো নতুন। তবে আমাদেরও তো ইচ্ছে করে। বোঝেনই তো। কী করা যায় বলেন তো?

তখন দই ভাই হালকা একটু সিরিয়াস হয়ে বলতে শুরু করলেন—

লাইফে একজন এলেই সবকিছু সুখের স্বর্গ হয়ে যাবে না; বরং লাইফে একজন আনতে গিয়ে যদি প্রেম করার চিন্তা করস, দেখবি প্রেম শুরু করতে গেলে ক্যাচাল, প্রেম চালায় নিতে গেলে ক্যাচাল, এমনকি প্রেম ছুটে গেলেও ক্যাচাল। এত্ত সব ক্যাচালের পরেও প্রেম চালিয়ে নিতে পারলে চালিয়ে যা। আর ক্যাচালমুক্ত লাইফ চাইলে, পটেনশিয়াল প্রেমকে জাস্ট ফ্রেন্ড হিসেবে রেখে তোর স্কিল ডেভেলপকে প্রেম হিসেবে সিলেক্ট কর। তাতে ফিউচার ভালো হবে। আবার কই ছিলা, কার ছবিতে লাইক দিলা এই সব কৈফিয়ত দেওয়া থেকেও বেঁচে যাবি।

প্রেম প্যাকআপ অ্যালার্ম

আর তোরা যারা প্রেম করতেছস, তোদের তিনটা প্রেম প্যাকআপ অ্যালার্ম বলে দিচ্ছি। সময় হলে কাজে লাগাবি—

১. তোর গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড তোকে যদি রেগুলার ইগনোর করা শুরু বা কোনো কিছু লুকানোর চেষ্টা করলে অথবা একবার ছেড়ে গিয়ে আবার ফেরত আসে। সে আসলে সুসময়ের মাছি। চুপেচাপে ঠিকই অন্য পাখির পেছনে ঘুরতেছে।

২. যে প্রেমিক-প্রেমিকারা দিনরাত ৫-৬ ঘণ্টা করে চ্যাটিং করে, তারা আসলে প্রেম করছে না; বরং দুজনের ফিউচারই ধ্বংস করছে। এদের প্রেমও টিকবে না। ফিউচারও থাকবে না।

৩. তোর পার্টনার যদি বলে, রিলেশন সাকসেসফুল করতে হলে তোকে স্টাবলিস্ট হতে হবে, এইটা-ওইটা প্রমাণ করতে হবে। সে আসলে ভেতরে-ভেতরে অন্য কাউকে খুঁজতেছে। তোর চাইতে বেশি স্টাবলিস্ট বা তোর চাইতে বেশি লাস্যময়ী কাউকে পেলেই তার ডালে ঝুলে পড়বে।

প্রেম সাকসেস করতে হলে ইমোশনকে টাইমবক্স করতে হবে; যাতে ডেইলি প্রেমের জন্য ১ ঘণ্টার বেশি গুতুর গুতুর না করা লাগে। দরকার হলে ইমোশনকে কন্ডিশনাল করে রাখতে হবে; যেটা পড়া দরকার সেটা পড়া শেষ হলে তারপর কথা বলবি। একটা কাজ শেষ করে তারপর প্রিয়জনের সঙ্গে শেয়ার করবি। তা ছাড়া প্রেম এখন ভালো চললেও ফিউচারে অনেক কারণে অনেক কিছু হতে পারে। কিন্তু তোর লাইফ, তোর ফিউচার সারা জীবন তোর সঙ্গে থাকবে। এগুলো মাথায় রেখে স্বাভাবিকভাবে, কো-অপারেশনের মেন্টালিটি নিয়ে কন্টিনিউ করতে পারলে কন্টিনিউ করবি।

ব্রেকফেইল ব্রেকআপ

কোনো কারণে ব্রেকআপ হয়ে গেলে, প্রেমের সুধা খাওয়ার ক্ষুধা উধাও হয়ে গেলে, ব্রেকআপ হওয়ার অবস্থা তৈরি হলে কিংবা কেউ তোকে ছেড়ে চলে গেলে—

প্রথমেই নিজেকে কনগ্রেচুলেট কর যে ওই গ্যাঞ্জামটা, ওই ভেজালটা, ইগনোর করার খারাপ লাগাগুলো চলে গেছে। প্যারা বিদায় হইছে। এখন তুই মুক্ত পাখি। এখন ইচ্ছেমতো তোর নিজের কাজ করতে পারবি। রাত-বিরাতে কারও সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্যাজানোর জন্য তুই আর একান্ত বাধ্যগত থাকবি না।

দ্বিতীয় যে কাজটা করবি সেটা হচ্ছে, তার যত ফোন নম্বর আছে, যত ছবি আছে সব ডিলিট করে দে। সে কী খাচ্ছে, কার সঙ্গে কথা বলতেছে, সেই খবর নেওয়ার কোনো দরকার নাই। আর ভুলেও চিন্তা করতে যাবি না, কেন ছেড়ে গেছে? আমার কী দোষ ছিল? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাবি না; বরং যে অতীত হয়ে গেছে, তাকে অতীত বানিয়ে চ্যাপ্টার ক্লোজ করে দে। সে ব্লক মারার আগেই তুই তাকে ব্লক মেরে দে।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

তৃতীয় যে কাজটা করবি সেটা হচ্ছে, কখনোই তোর এক্স যে ছিল তাকে ভোলার চেষ্টা করবি না। যত বেশি ভোলার চেষ্টা করবি, তত বেশি ওইটা তোর ঘাড়ে চেপে বসবে। জাস্ট এইটাকে নরমালভাবে নিবি। এমন একটা ভাব যে ভালো ফ্রেন্ড ছিল, এখন নাই। আর কিছু না। আর তোর এখন সময় সামনে তাকানোর, নতুন অপরচুনিটিগুলো ধরার, নতুন স্কিল ডেভেলপ করার। তাই সামনে কী কী করা লাগবে, সেই অনুসারে অ্যাকশন সেট কর। ভুলেও আলমারির চিপার মধ্যে বসে থাকবি না। দরকার হলে নতুন জামাকাপড় পরে, ভালো পারফিউম মেরে ফ্রেন্ডদের সঙ্গে দেখা করতে যা।

যদি মনে হয় লাইফে সঙ্গী দরকার, তাহলে বেস্ট ফ্রেন্ড জোগাড় কর। গ্রুপে ঘোরাফেরা কর। তাইলে প্রেমের ক্যাচাল থাকবে না। প্রেমের স্বৈরাচারীও থাকবে না। আর চ্যাকা খেয়ে তোকে লাফাঙ্গা হয়ে পালিয়ে বেড়ানো লাগবে না।

জেদ করে, খারাপ সময় ভেদ করার ফুডানি

দই ভাইয়ের কথাগুলো ভালোই লাগছে। অনেক প্র্যাকটিক্যাল ও মজার কথা। তাই তিনি বলছেন আর সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে—

কোনো একটা কিছু খারাপ হলে, কেউ তোর সঙ্গে অন্যায় করলে বা কোনো কিছু তোর জীবন থেকে চলে গেলে, তোর ভেতরে তিন ধরনের রিফ্লেকশন হতে পারে। এক. মন খারাপ করা। দুই. রাগ করা। তিন. যে কারণে খারাপ হইছে, সেটা দেখিয়ে দিতে জেদ করা।

এই তিনটা অপশনের মধ্যে সবচেয়ে সহজ আর সেইফ অপশন হচ্ছে মন খারাপ করা। কারণ মন খারাপ করতে কোনো কষ্ট করতে হয় না। চুপচাপ বসে বসে আরামসে মন খারাপ করা যায়। অন্যদিকে রাগ করলে ঘটনাটা ফেইস করতে হয়। যে ঘটনা ঘটাইছে, তার সঙ্গে লজিক দিয়ে চিল্লাচিল্লি করতে হয়। আবার জেদ করলে, নিজের কোয়ালিফিকেশন বাড়ানোর জন্য, ওর চাইতে আরও ওপরের লেভেলে নিজেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হার্ডওয়ার্ক করতে হবে। দেখায় দেব সেই মেন্টালিটি নিয়ে লেগে থাকতে হয়।

তবে আমরা এত বোকা না যে মন খারাপ করার মতো আরামের অপশন ছেড়ে দিয়ে, রাগ করা বা জেদ ধরার মতো কঠিন অপশনগুলো বেছে নেব।

শুন, আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কেউ অতীতকে পাল্টাতে পারেনি। তুইও পাল্টাতে পারবি না। তারপরেও দুনিয়ার ৯০ শতাংশ মানুষ সারা দিন অতীতের বিষাদ আঁকড়ে ধরে হাহাকার করে করে তাদের লাইফের বারোটা বাজিয়ে ফেলে। বাকি ১০ শতাংশ মানুষের যখনই মন খারাপ হয়েছে, তখনি সে রিফ্লেক্ট না করে নিজেকে জোর করে রিফ্রেশ করে। কষ্টের পাহাড় তৈরি করাকে রিফিউজ করে। চোখের পানি মুছে ফেলে, দরজা আটকিয়ে একটু একটু করে নিজেকে রি-ডিফাইন করে।

তাই আজকের পর যতবার খারাপ হওয়ার ঘটনা ঘটবে বা পুরোনো ঘটনার কথা মনে পড়বে, ততবার মন খারাপ না করে, একটা করে জেদ সেট করবি। তারপর মিনিমাম এক ঘণ্টা ধরে তোর সেই জেদ বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করবি। ঠিক যতবার মনে পড়বে, ততবার। তাইলে তোর খারাপ সময়টাই তোকে এনার্জি দেবে। তোকে লাইনে রাখবে। দিনের পর দিন,

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

মাসের পর মাস। এটা একটানা কন্টিনিউ করতে করতে নিজের অজান্তেই একসময় তুই নতুন শেইপে, নতুন লেভেলে উঠে যাবি।

এর পাশাপাশি খেয়াল করবি কোথায় কোথায় গেলে তোর পুরোনো কথা মনে হয় বা কোন কোন জায়গায় মনে হয় বা কার সঙ্গে কথা বলতে গেলে মনে হয়। এইগুলো হচ্ছে ট্রিগার পয়েন্ট। সম্ভব হলে এই ট্রিগার পয়েন্টগুলো সরিয়ে ফেলবি বা কমিয়ে ফেলবি। আর সরানো বা কমানো সম্ভব না হলে যতবার এই জিনিসগুলো ট্রিগার হবে, ততবার তুই এক ঘণ্টা নিজেকে ডেভেলপ করার জেদ সেট করবি। জিনিসটা একটা চক্রের মতো হবে। মন খারাপ টু অ্যাকশন টেকিং চক্র।

মনে রাখবি, খারাপ সিচুয়েশনে পড়া সমস্যা না। সমস্যা হচ্ছে খারাপ সিচুয়েশনে নিজেকে আটকে রাখা। খারাপ রেজাল্ট করাটা যতটা না দোষের, তার চাইতে বেশি দোষের হচ্ছে সামনের বার ভালো রেজাল্ট করার জন্য আগের চাইতে চার গুণ বেশি চেষ্টা না করা। পাল্টানোর আশা করাতে কেউ ভুল করে না। ভুল থাকে আশা অনুসারে কাজগুলো করার চেষ্টা করায়।

তা ছাড়া কেউ তোর কষ্টের, হতাশার কিংবা মন খারাপের কারণ ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুই তার কার্যকলাপকে তোর ভেতরের কষ্ট, হতাশার কিংবা মন খারাপ মতো করে ভাবতে শুরু না করস। অন্য কেউ অনেক কিছু করতে পারবে, কিন্তু তোর ব্রেনের ভেতরে, তোর ইমোশনের গলিতে কন্ট্রোল করতে পারবে না। সেই কন্ট্রোল শুধু তোর। একমাত্র তুই-ই পারস একটু একটু করে তোর লাইফস্টাইলকে এডিট করতে। তাহলেই তোর ধাক্কা খাওয়া থেকে, ব্যর্থ হওয়া থেকে তোর নিজের করে বলার মতো একটা গল্প তৈরি হবে।

If you are depressed, you are living in the past. If you are anxious, you are living in the future. If you are at peace, you are living in the present. — Lao Tzu

ফিয়ার মাতৃকেয়ার ক্লিনিক

রায়হান ভাই ভয় নিয়ে কথা বলছে। দই ভাই, প্রেম ফিউচার এবং স্টুডেন্ট লাইফ ব্যালেন্স করা নিয়ে বিভিন্ন কথা বলছে। এখন এত কিছু নিয়ে তোর ভয় লাগলে তুই পরের পাতার ফিয়ার মাতৃকেয়ার ক্লিনিকে চলে যা। সেখানে একটা চাকা দেওয়া আছে। যেটা হচ্ছে ভয়ের চাকা বা হুইল অফ কনসার্ন। চাকার প্রতিটা খোপের মধ্যে একটা করে পুঁচকা গোল্লা দেওয়া আছে। ওই চাকার ভয় বা কনসার্নগুলোর মধ্যে যে ভয়টা তোর সবচেয়ে বেশি, সেই খোপের ছোট গোল্লার মধ্যে ১ লেখ। তারপর তোর ভয়ের লেভেল অনুসারে সিরিয়াল করে ১, ২, ৩ লিখে যা।

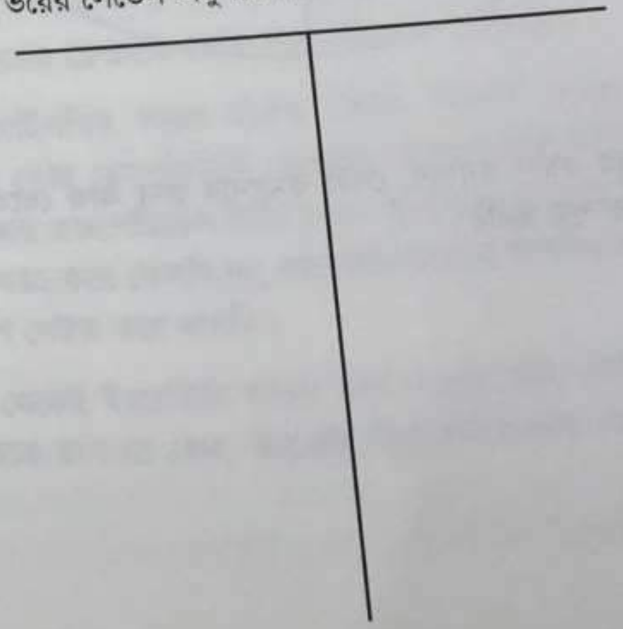

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

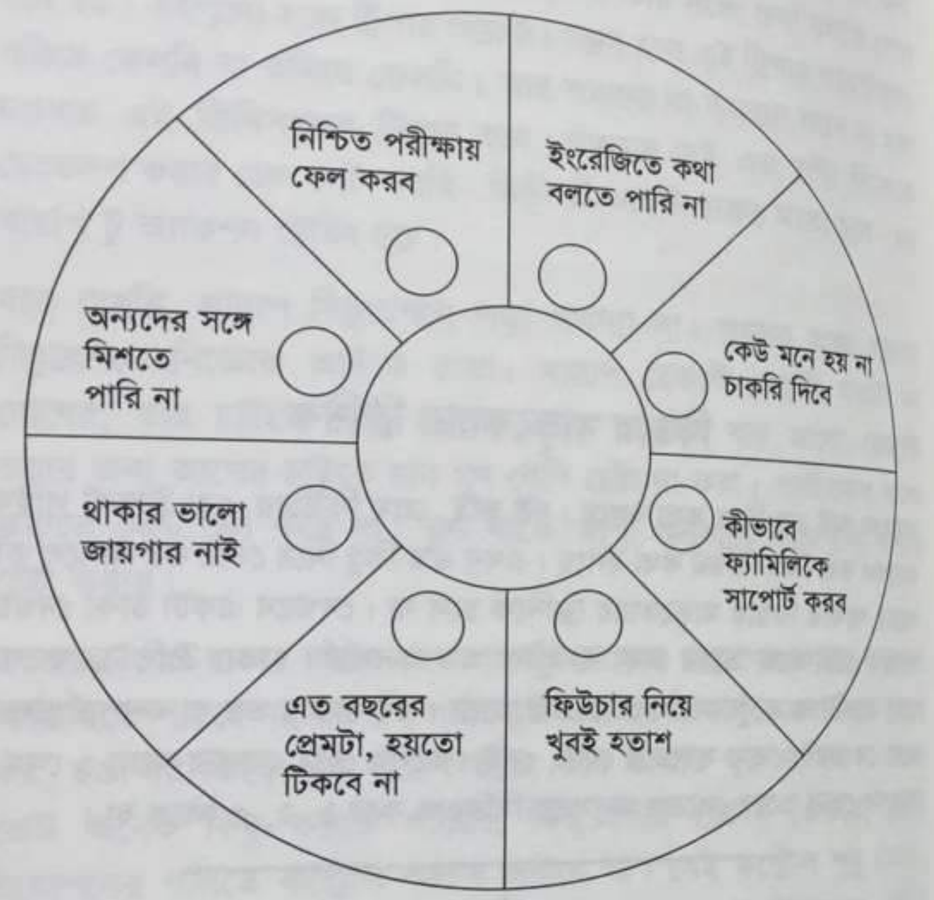

যেটা তোর নম্বর ওয়ান কনসার্ন, সেটা কমানোর জন্য আজ থেকে তুই কোন তিনটা কাজ করা শুরু করবি।

১.

২.

৩.

কমপ্লিট গাইডলাইন গিলে, দেখাও তোমার মাস্তানি

দই ভাই উঠতে যাবেন। তখন ফার্স্ট ইয়ারের একজন প্রশ্ন করল।

—ভাইয়া, আমরা আমাদের ভার্সিটির লাইফটা কীভাবে চালাব। কোন ইয়ারে কোন জিনিসে ফোকাস করব। একটা কমপ্লিট গাইডলাইন কোথাও পাই না।

আসলেই তো, কেউ কোথাও বলে দিচ্ছে না। একটা ভার্সিটির লাইফ কীভাবে চালাতে হবে। আমি যেহেতু স্টুডেন্ট লাইফ পার করে ফেলেছি। অনেক দিন ধরে ভালো মাল্টি ন্যাশনালে জব করছি। আমি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে ডিটেইল বলে দিচ্ছি। তোরা শুধু চার বছর হেডলাইট জ্বালিয়ে রাখবি—

দবির ভাই এক এক করে বলতেছে। আর সব জুনিয়র পোলাপান মোবাইলে টাইপ করে নিচ্ছে। দু-একজন দেখি মোবাইলে রেকর্ডও করছে। যাতে বাসায় গিয়ে নিজেই একটা লিস্ট বানিয়ে ফেলতে পারে। তারপর টিক চিহ্ন দিয়ে দেখবে কোনটা কোনটা করা হইছে আর কোনটা কোনটা করা বাকি।

প্রথম বর্ষের পাঁচটি কাজ

১. ক্লাসে যেহেতু যেতেই হবে, তাই ক্লাসে মনোযোগ দিবি। ভালো রেজাল্ট করার চেষ্টা করবি।

২. প্রেম করস আর না-ই করস, কিছু ফ্রেন্ডশিপ ডেভেলপ করবি। কারণ ভার্সিটি লাইফের ফ্রেন্ডরাই তোর সারা জীবনের বেস্ট ফ্রেন্ড।

৩. তুই কোটিপতির সন্তান হলেও তোকে ইনকাম করার চেষ্টা করতে হবে। এতে তোর রেসপন্সিবিলি নেওয়ার, অন্যকে সার্ভ করার, টাকাপয়সা হ্যান্ডেল করার এক্সপেরিয়েন্স তৈরি হবে। আর ইনকাম করা শুরু করলে সব একসঙ্গে খরচ করে ফেলবি না; বরং অন্য ব্যাংকে আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলে ২০ শতাংশ সেইভ করে রাখবি।

৪. প্রথম থেকেই ইংরেজিটা ভালো করে শেখার চেষ্টা করবি। তুই জীবনে যা-ই করতে চাস না কেন, ইংরেজি জিনিসটা তোকে পদে পদে এগিয়ে রাখবে।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

৫. অন্তত একজন ফ্যাকাল্টি বা সিনিয়র কারও সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ লেভেলের ইনফরমাল ইন্টার‍্যাকশন রাখার চেষ্টা করবি। যার কাছে পার্সোনাল সমস্যা, পড়ালেখার ঝামেলা, ফিউচার নিয়ে, কনসার্ন নিয়ে আলোচনা করতে পারবি। সে মূলত তোর মেন্টর, গাইড বা কোচ হিসেবে থাকবে।

দ্বিতীয় বর্ষের পাঁচটি কাজ

১. পড়ালেখার বাইরে এমন কিছু একটা করার চেষ্টা করবি, যেটাতে তুই অন্য সবার চাইতে ভালো। সেটা হবে ওয়েবসাইট বানানো, পোস্টার ডিজাইন, ছবি এডিট করা। অ্যানিমেশন, পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, প্রোগ্রামিং, লেখালেখি বা অন্য কিছু। এটা পরবর্তী সময়ে প্রফেশনাল এক্সপেরিয়েন্স বা এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশন হিসেবে চাকরি পেতে হেল্প করবে।

২. তোকে স্ট্রেজে উঠতে হবে। মিনিমাম ৫০ জন মানুষের সামনে দাঁড়াতেই হবে। সেটা বক্তৃতা দিতে হোক, উপস্থাপনা, নাচ, গান বা নাটক, কবিতা আবৃত্তি, যেটাই হোক। এতে তোর পাবলিকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় কাটবে।

৩. কখনোই ভিডিও গেমসের জগতে প্রবেশ করবি না। তবে ফ্রি সময় পেলে কিছু অলটাইম হিট মুভি দেখে ফেলবি। পাঠ্যবইয়ের বাইরের জগতে হানা দিবি। সেটা হতে পারে কিছু বিখ্যাত বই (বাংলা বা ইংরেজি)।

৪.পড়ালেখা ঠিক রেখে কোনো একটা অর্গানাইজেশনে যোগ দিবি। মিনিমাম একটা অর্গানাইজেশনের সব ইভেন্টে যাবি। কমিটি মেম্বার হওয়ার চেষ্টা করবি। এতে তোর লিডারশিপ স্কিল ডেভেলপ হবে এবং সিভিতে লেখার মতো একটা জিনিস যোগ হবে।

৫. কোথাও না কোথাও লেখা ছাপানোর চেষ্টা করবি। সেটা গল্প-কবিতা, ইংরেজি আর্টিকেলের বাংলা অনুবাদ বা অন্য কিছু হতে পারে।

তৃতীয় বর্ষের পাঁচটি কাজ

১. তৃতীয় বর্ষে উঠে তুই যে ফিল্ডে কাজ করতে চাস, সেই ফিল্ডের কমপক্ষে ১০ জন প্রফেশনালের সঙ্গে কানেকশন ডেভেলপ করবি। সেটা হতে পারে ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র, দেশি বা বিদেশি ভার্সিটির প্রফেসর। তাদের রিপ্লাই না পাওয়ার আশা নিয়েই রিমেইল করে দিবি; অর্থাৎ তুই একটু একটু করে নেটওয়ার্কিং শুরু করবি।

২. তৃতীয় বর্ষে থাকতে থাকতেই তোকে একটু একটু করে তোর রেজুমি বা সিভি বানানো শুরু করে দিতে হবে। তাহলে তুই আগে থেকেই বুঝতে পারবি যে তোর কোথায় কোথায় গ্যাপ আছে এবং সেই গ্যাপগুলোর এরিয়াতে ইমপ্রুভ করে ফেলার অনেক সময় পাবি।

৩. তুই যে সাবজেক্টেই পড়স না কেন, সেই সাবজেক্টের যেকোনো একটা এরিয়ায় তুই টেক্সট বইয়ের বা ক্লাসের পড়ার বাইরে বেশি জানার চেষ্টা করবি। গুগলে সার্চ দিয়ে আর্টিকেল বের করবি। নিজের ভেতরে কিউরিসিটি গ্রো করবি। তাহলে এটাই হবে তোর এরিয়া অব ইন্টারেস্ট।

৪. কয়েকজন মিলে ডিপার্টমেন্টে একটা নিউজলেটার বা দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করে ফেলবি। নিজেরাই মিলেমিশে বিভিন্ন আর্টিকেল জোগাড় করে লিখে দিবি।

৫. ক্লাসমেটদের সঙ্গে মিলে গ্রুপ অ্যাকটিভিটিস করবি। সম্ভব হলে ফ্রেন্ডদের সঙ্গে কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, বান্দরবান, সুন্দরবন, কাঁটাবন ঘুরতে যাবি। এতে তোর টিমওয়ার্ক এবং সেলফ এওয়ারনেস ডেভেলপ হবে।

চতুর্থ বর্ষের পাঁচটি কাজ

১. বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ক্যারিয়ার ক্লাব, ভলান্টিয়ারিং, ফ্রি ইন্টার্নশিপ, পার্টটাইম জব, প্রদর্শনীর সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ—কোনোটাই বাদ দিবি না। সম্ভব হলে সবগুলোতে যাবি। এতে তোর কমিউনিকেশন স্কিল সেই লেভেলে উঠে যাবে। পরে চাকরির লাইফে গিয়ে আমাকে থ্যাংকু বলবি।

২. বিভিন্ন চাকরিতে অ্যাপ্লাই করা শুরু করে দিবি। আন্দাজে মান্দাজে চোখ বন্ধ করে সিভি দিয়ে দিবি না; বরং প্রতিটি চাকরির জন্য সিভি কাস্টমাইজ করে তারপর দিবি। তাতে কিছু ইন্টারভিউ দেওয়ার অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে।

৩. তোকে একটা না একটা ইভেন্ট অর্গানাইজ করার মেইন দায়িত্বে থাকতে হবে। সেটা ইফতার পার্টি, বৈশাখী মেলা, rag পার্টি, জব ফেয়ার, অ্যালামনাই রিউনিয়ন—যেটাই হোক না কেন। এতে তুই বুঝতে পারবি

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

কীভাবে বিভিন্ন ধরনের মানুষ হ্যান্ডেল করতে হয়। কীভাবে বাজেট, প্ল্যানিং, মানুষের কাছ থেকে হেল্প আদায় করে নিতে হয়।

৪. পাস করে বের হওয়ার আগেই তোকে বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তুই দেশে চাকরি করবি, না বিদেশে হায়ার স্টাডি করতে যাবি, নাকি বিসিএস দিবি, নাকি নিজে নিজে ব্যবসা করার চেষ্টা করবি। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তোর অবস্থা, ফ্যামিলি এবং প্রিয়জন থাকলে সব মিলিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৫. ফ্যামিলির সঙ্গে সব সময় কানেকশন রাখবি। কী করতে চাইছিস। কীভাবে করার চেষ্টা করতেছস। তুই ভালো করস, আর খারাপ করস, এক বছরের জায়গায় তিন বছর ফেল মারস। ফ্যামিলিই তোর নিশ্চিত আশ্রয়। খোলা মনে সাহস রেখে তাদের সঙ্গে শেয়ার করবি। তারা সব সময় তোকে আগলে রাখবে।

মনে রাখবি, ভার্সিটি শুধু একটা প্ল্যাটফর্ম। এইখানে ভালো করার সুযোগ আছে। আবার লাইফ ধ্বংস করার অপশনও আছে। তাই একটু খেয়াল করে করে লাইফ ঠিক রাখতে পারলে, স্টুডেন্ট লাইফ অনেক বেশি ইফেক্টিভ এবং মজার হয়ে উঠবে।

কমপ্লিট গাইডলাইন ক্লিনিক

দই ভাইকে থ্যাংকু না বলে আর পারছি না। এত চমৎকারভাবে চার বছরে কবে কী করতে হবে, সেটা স্প্যাসিফিকভাবে বলে দিয়েছেন। ওনার সম্মানার্থে একটা বিশেষ ক্লিনিক খোলা হলো। তাই তুই তোর ভার্সিটির লাইফে যখন সময় পাবি, তখনই কমপ্লিট গাইডলাইন ক্লিনিকে চলে যাবি। তারপর টিক চিহ্ন দিয়ে দিয়ে চেক করে দেখবি কোন কোন ইয়ারের কী কী জিনিস তুই কমপ্লিট করছস। আর যদি কোনোটা মিস হয়ে যায়, তাহলে সেটা পরের বছরে পুষিয়ে দিবি। আর এই ক্লিনিকের কথা তোর তিনজন ক্লোজ ফ্রেন্ডকেও বলে দিবি। তাহলে তারাও কমপ্লিট গাইডলাইন পাবে। দই ভাইয়ের মতো তোকেও থ্যাংকু বলবে।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

ফার্স্ট ইয়ার	☐ প্রতিটা ক্লাসে সিরিয়াস মনোযোগ দিচ্ছি ☐ আমার একজন বেস্ট ফ্রেন্ড আছে ☐ নিজের ইনকামের ২০ শতাংশ সেইভ করছি ☐ শুরু থেকেই ইংরেজি ভালো করে শিখছি ☐ ফ্যাকাল্টি/সিনিয়রকে মেন্টর হিসেবে রাখছি
সেকেন্ড ইয়ার	☐ পড়ালেখার বাইরেও স্কিল ডেভেলপ করতেছি ☐ মিনিমাম ৫০ জনের সামনে পারফর্ম করছি ☐ কিছু অলটাইম হিট মুভি দেখছি বা বই পড়ছি ☐ মিনিমাম একটা অর্গানাইজেশনের কমিটি মেম্বার ☐ কোথাও না কোথাও লেখা ছাপানোর চেষ্টা করছি
থার্ড ইয়ার	☐ কমপক্ষে দশজন প্রোফেশনালের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং ☐ নিজে নিজে রেজুমি বা সিভি বানাইছি ☐ একটা একাডেমিক এরিয়া অব ইন্টারেস্ট আছে ☐ নিউজলেটার বা দেয়াল পত্রিকা পাবলিশ করছি ☐ ক্লাসমেটদের সঙ্গে মিলে গ্রুপ অ্যাকটিভিটিস করি
ফোর্থ ইয়ার	☐ ভলান্টিয়ারিং/সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ/ইন্টার্ন করেছি ☐ চাকরির জন্য সিরিয়াসলি অ্যাপ্লাই করছি ☐ ইভেন্ট অর্গানাইজ করার মেইন দায়িত্বে ছিলাম ☐ পাস করে কী করব, সেটা ফাইনাল করছি ☐ ফ্যামিলির সঙ্গে সব সময় কানেকশন রাখতেছি

যারা স্কুল বা কলেজে পড়ে তাদের জন্য দই ভাই আরেকটা কমপ্লিট গাইডলাইন বলে দিছেন—

নবম শ্রেণি	☐ প্রতিদিন মিনিমাম ৩ ঘণ্টা সিরিয়াসলি পড়বি ☐ কোনো কিছু না বুঝলে অনলাইনে ভিডিও দেখবি ☐ গণিত অলিম্পিয়াড, প্রোগ্রামিং কনটেস্টে যাবি ☐ কালচারাল প্রোগ্রামে কিছু একটা পারফর্ম করবি
দশম শ্রেণি	☐ ১০ম-এর পড়া ঠিক রেখে ৯ম-এর পড়া রিভিশন দিবি ☐ প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা, পরীক্ষার আগে ৮ ঘণ্টা করে পড়বি ☐ মোবাইল/প্রেম/ফালতু ফ্রেন্ড থেকে ১০০ হাত দূরে থাকবি ☐ পড়ার বাইরে অন্য সব কাজ আপাতত বন্ধ রাখবি
একাদশ শ্রেণি	☐ কলেজ মানে স্বাধীনতার নামে ফাঁকিবাজি করা না ☐ সিরিয়াস স্টুডেন্টদের সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ ডেভেলপ করবি ☐ শুরু থেকেই বইয়ের কোনাকানি ভালো করে পড়বি ☐ অলিম্পিয়াড/কনটেস্ট/কালচারাল ইভেন্টে যাবি
দ্বাদশ শ্রেণি	☐ সেকেন্ড ইয়ারে লাইফের সবচেয়ে বেশি কষ্ট করবি ☐ মোবাইল আসক্তি/প্রেম থেকে ১০০% বিদায় নিবি ☐ ভর্তি কোচিং ও ভর্তি পরীক্ষার জন্য টার্গেট সেট করবি ☐ পরীক্ষার আগের চার মাস দরজা বন্ধ করে পড়বি

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

মাইক্রো লেভেলে হেরে মোরা, মেগা লেভেলে বুঝি

নবীনবরণ প্রোগ্রামে ভলান্টিয়ারিং করাটা ছিল নুয়াজের লাইফ ঘুরিয়ে দেওয়ার ইভেন্ট। তারপর থেকে ধীরে ধীরে সে নিজেকে সফট ডিসিপ্লিনের মধ্যে আনছে। সময় নষ্টকারী হ্যাবিটগুলো কন্ট্রোল করছে। ডেইলি পড়ালেখায় সময় দিছে। যে আগে নিয়মিত ৩.১৩-এর মতো পাইত, সে এখন এক সেমিস্টারে ৩.৮১ পেয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিছে। তারপর থেকে কেউ আর তাকে লুজ বা লুজ মোশন বলে ডাকে না।

নিজের চেষ্টা আর সাধনা দিয়ে সে লুজ থেকে টাইট হইছে। ক্যাম্পাসের ক্যারিয়ার ক্লাবের সেক্রিটারি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছে।

মাঝেমধ্যে জুনিয়র পোলাপানরা তার কাছে হেল্প চাইতে আসে। এই তো সেদিন ফার্স্ট ইয়ারের রিমন এসে তাকে জিজ্ঞেস করছে :

—ভাই, ফার্স্ট সেমিস্টারে তো ভালো করতে পারিনি। এখন কী করব?

নুয়াজের নিজের কথা মনে পড়ে গেল। তারও ফার্স্ট ইয়ারে সেইম কন্ডিশন হইছিল। সোহান ভাইয়ের কাছ থেকে সাজেশন পেয়ে সেগুলো একটু একটু করে অ্যাপ্লাই করতে করতে সে নিজেকে লাইনে ফেরত আনছে। তাই সোহান ভাইকে মনে মনে একটু থ্যাংকু দিয়ে সে বলতে শুরু করল—

শুন, কেউ পরীক্ষায় ফেল করে না, প্রিপারেশন নিতে ফেল করে। কেউ চাকরি পেতে ব্যর্থ হয় না, ইন্টারভিউর প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়। একইভাবে পরীক্ষার হল বা প্রশ্নের ধরন কারও রেজাল্ট নির্ধারণ করে না; বরং তার রেজাল্ট নির্ধারণ হয়—ক্লাসনোট তোলার সিনসিয়ারিটি, ক্লাসটেস্ট দেওয়ার সিরিয়াসনেস আর পরীক্ষার আগে প্রিপারেশন নেওয়ার ডেসপারেটনেস দিয়ে। সে জন্যই পরীক্ষার প্রশ্ন দেখে সবার ডায়রিয়া হয়ে গেলেও যে ফার্স্ট হওয়ার, সে ঠিকই ফার্স্ট হবে। বাকিরা প্রশ্নের বাঁশ, স্যারের পড়াতে না পারা, পিরিতির ক্যাচানি, জাকারবার্গের টানাটানিকে দায়ী করে সান্ত্বনা খুঁজবে।

একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারা যায়, লাইফের সব ব্যর্থতাই মাইক্রো লেভেলের ব্যর্থতা দিয়ে শুরু হয়। সে জন্যই আজকের কাজগুলো আজকে শেষ না করলে, আজকের পাওনাগুলো আজকে আদায় না করে, সেগুলো খেলা দেখা, ইন্টারনেট বা মোবাইল ফোনকে দিয়ে দিলে, আজকের হিসাবের খাতায় মাইক্রো লেভেলের ব্যর্থতা জমা হবে। সেগুলোই এক সপ্তাহ পরে

মিনি সাইজের ব্যর্থতা আর এক বছর পরে মেগা সাইজের ব্যর্থতার হয়ে তোর কাছে ফিরে আসবে।

যেমন ধর, ক্লাসে মনোযোগ দিতে না পারা, কিছু না বুঝলে সঙ্গে সঙ্গে স্যারের কাছ থেকে, ফ্রেন্ডের কাছ থেকে কিংবা কোচিং সেন্টারে গিয়ে বোঝার চেষ্টা না করাটা হচ্ছে মাইক্রো লেভেলের ব্যর্থতা। এই মাইক্রো ব্যর্থতাগুলো কারেক্ট করে না নিলে, দুই সপ্তাহ পরে ক্লাসটেস্টে যখন ফেল করে বসবি, তখন এই ফেল করার মাধ্যমে, মিনি সাইজের ব্যর্থতা এসে তোকে ওয়ার্নিং দেবে। তাতেও তোর হুঁশ না ফিরলে পরীক্ষায় ফেল করে, মেগা সাইজের ব্যর্থতা নেমে আসবে।

মাইক্রো লেভেলের ব্যর্থতাগুলো ছোট ছোট। সেগুলোর ইমপ্যাক্টও ছোট। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা এইগুলোকে ইগনোর করি। অথচ এইগুলোই একটু একটু করে আমাদের সামনে ব্যর্থতার পাহাড় গড়ে তোলে। তাই আজকের পর থেকে লাইফের মেগা লেভেলের ব্যর্থতা এভয়েড করতে চাইলে, মাইক্রো লেভেলের ব্যর্থতাগুলো কন্ট্রোল করতে হবে।

Ultimately, what we regret is not a failure, but the failure to act.
—Adam Grant

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

পড়া মনে না থাকলেও ক্লাশের চিজটারে খুঁজি

কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পর রিমন জিজ্ঞেস করল :

—ভাই, আমি যে একদম পড়ি না, তা কিন্তু না। মাঝেমধ্যে পড়ি। কিন্তু যেটাই পড়ি, মনে থাকে না।

তখন নুয়াজ বলল—

আরে ভাই, পড়লে যদি মনে না-ই থাকে, তাহলে আগে যে একবার পড়ছিলি, সেটা মনে আছে কেমনে? ভুলে গেলে তো আগে যে পড়ছিলি, সেই কথাও ভুলে যাওয়ার কথা। নাকি ভুলে যাওয়াটাও ঠিকমতো ভুলতে পারতেছস না।

আসলে তুই পুরাপুরি ভুলে যাস নাই। তোর আবছা আবছা মনে আছে। আরেকবার পড়তে শুরু করলে আগেরবারের মতো বেশি সময় লাগবে না; বরং অল্প সময়ের মধ্যে পুরোটা রিভিশন দিয়ে দিতে পারবি। তা ছাড়া দুনিয়ার তুই একমাত্র মানুষ না, যার পড়া মনে থাকে না; বরং দুনিয়ার সবাই ভুলে যায়। এই ভুলে যাওয়ার ওপর জার্মান গবেষক Hermann Ebbinghaus ১৮৮৫ সালে একটা গ্রাফ প্রকাশ করছিলেন। যেটাকে বলে Forgetting Curve বা ভুলে যাওয়ার গ্রাফ। এই গ্রাফের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবি যে দুনিয়ার সবাই এক দিন পরে অর্ধেকের বেশি জিনিস ভুলে যায়। আর সাত দিন পরে ৯৯ শতাংশ জিনিস বেমালুম ভুলে যায়।

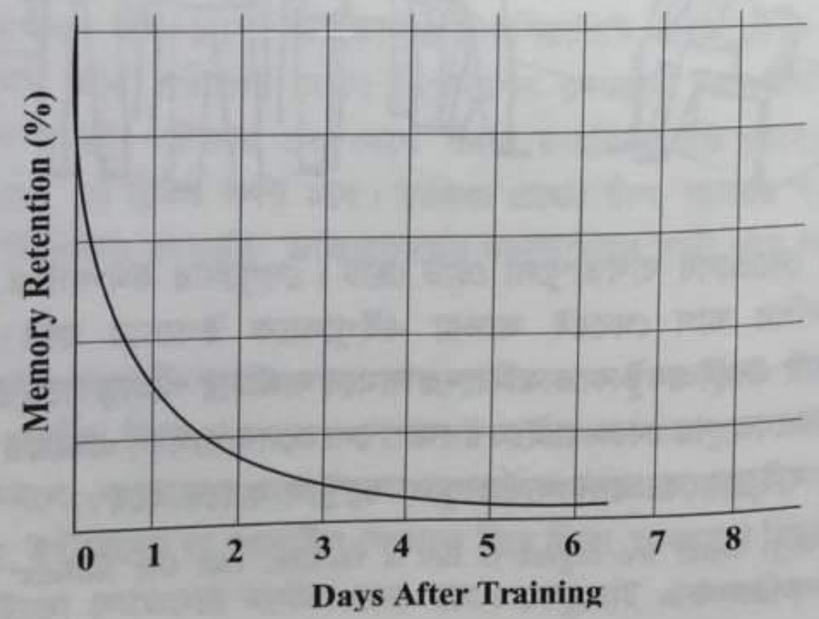

এই ভুলে যাওয়া ১০০ ভাগ দূর করা সম্ভব না। কারণ তুই সারা জীবন যত কিছু খাইছস তার সবকিছু যেমন তোর শরীরে থাকবে না, তেমনি সারা জীবন যত কিছু শিখছস তার সবকিছুই তোর মেমরিতে থাকবে না। তবে তুই চাইলে মেমরিতে বেশি দিন রাখার কিছু সিম্পল টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারস।

১. ব্রেকডাউন গ্রুপিং টেকনিক

ধর একটা ফোন নম্বর ০১৭১৭৬৫৩৯২২। এইটা একসঙ্গে পড়লে কিন্তু ১০ মিনিটের বেশি মনে থাকবে না। তাই পড়ার সময় এইটাকে ভেঙে ভেঙে ০১৭১৭-৬৫৩-৯২২ স্টাইলে পড়বি। পড়ার সময় ০১৭১৭ (আধা সেকেন্ড দম নিয়ে চিন্তা করবি গ্রামীণের ৭, অর্থাৎ ০১৭১-এর ৭) তারপর আধা সেকেন্ড সময় নিয়ে পড়বি ৬৫৩-এর আরও আধা সেকেন্ড দম নিয়ে ৯২২। তাহলে পুরো জিনিসটা পার্ট বাই পার্ট ভাগ হয়ে মাথায় সেট হয়ে যাবে। দরকার হলে হাইফেন দিয়ে দিয়ে কাগজে লেখ। ০১৭১৭-৬৫৩-৯২২ এতে পড়তে, মনে রাখতে, এমনকি রিভাইজ দিতেও সহজ হবে।

এই ব্রেকডাউন গ্রুপিং টেকনিকটা পড়ালেখার ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লাই করতে পারস। বড় সাইজের প্রকারভেদ, ব্যবসায় নীতি, বিশাল সাইজের আপেক্ষিকতার সূত্র—এইগুলো এই ব্রেকডাউন সিস্টেমে পড়বি। তারপর ব্রেকডাউনগুলো পর্যন্ত মনে রাখবি। তাহলে একটানা পুরো প্রমাণ মনে রাখা অনেক বেশি কষ্টের হলেও ছোট ছোট অংশে ভাগ করে ফেললে সেটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

২. ক্লাইমেক্স দিয়ে ক্লু টেকনিক

আমরা সিনেমা দেখলে পুরো সিনেমার ডিটেইল আমাদের মনে থাকে না। কিন্তু মেইন ক্লাইমেক্স ঠিকই মনে থাকে। খেলা দেখার সময়ও কখন গোল করল, কখন কে আউট হলো সেটা মনে থাকে। কিন্তু খেলার প্রতিটা সেকেন্ড ক্লিয়ারভাবে মনে থাকে না। এই সিস্টেমটা পড়া মনে রাখার জন্য কাজে লাগানো যায়।

যেমন ধর নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র, 'কোনো বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যে দিকে ক্রিয়া করে বস্তুর ভরবেগের

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

পরিবর্তন সেদিকেই ঘটে।' পড়ার সময় নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করবি—এই সূত্রের মেইন পয়েন্ট কী? একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবি এই সূত্রের মেইন পয়েন্ট হচ্ছে, 'ভরবেগের পরিবর্তন' এবং ভরবেগের পরিবর্তনের দুটি বৈশিষ্ট্য বলছে। এক. ভরবেগের পরিবর্তন—বলের সমানুপাতিক। দুই. ভরবেগের পরিবর্তন—বলের দিকে।

এখন তোর ব্রেইনে, এই সূত্রের নামের সঙ্গে মেইন পয়েন্টের কানেকশন সেট করে ফেল। আর যদি হাইলাইটার, কলম বা পেনসিল দিয়ে দাগিয়ে পড়ার অভ্যাস থাকে, তাহলে শুধু মেইন পয়েন্ট বা ক্লুগুলোকে দাগাবি। যাতে রিভাইজ দেওয়ার সময় দাগানো অংশের নিচে চোখ আগে চলে যায়।

৩. ভিজ্যুয়ালাইজ করার টেকনিক

শুধু পড়ে গেলে পড়া বেশিদিন মনে থাকবে না; বরং পড়া মনে রাখতে হলে পড়ার পর প্রতিদিন এক ঘণ্টা সময় রাখবি। যেটা পড়ছস, সেটা বইখাতা না দেখে, স্টেপ বাই স্টেপ ভিজ্যুয়ালাইজ করার চেষ্টা করবি। যদি চোখ বন্ধ করে পুরো জিনিস মেমরি থেকে রিকভার করতে না পারস, তাহলে আরেকবার দেখে নিয়ে মনে মনে ভিজ্যুয়ালাইজ করার চেষ্টা করবি। যত ক্লিয়ারলি ভিজ্যুয়ালাইজ করতে পারবি, পড়া তত বেশি দিন মনে থাকবে।

৪. ইমোশনাল কানেকশন টেকনিক

চার দিন আগে কী পড়ছিলি ভুলে গেছস। কিন্তু চার বছর আগে কার ওপরে ক্রাশ খাইছিলি, পাঁচ বছর আগে মনের মানুষের সঙ্গে কোন সিনেমা দেখছিলি, কোন দোকানে ফুসকা খেয়ে দুজনে রিকশায় উঠছিলি—এইগুলো ঠিকই মনে আছে। কারণ এইগুলো সবই ইমোশন দিয়ে লাইফের সঙ্গে গেঁথে রাখছস। আজকের পর থেকে একসাইটেড হয়ে পড়তে বসবি। পড়া শেষ হওয়ার পর, সেই এক্সাইটমেন্ট ফিল করবি। নিজেকে বাহবা দিবি। পুলকিত অনুভব করবি। দেখবি জিনিসগুলো সহজ হয়ে গেছে। বেশি দিন মনে থাকছে।

ধর, ফিজিকসের $F = ma$ সূত্র পড়ার সময় ভাবলি, বাসা থেকে মেসে আসার সময় আমি যে বল দিয়ে আমার লাগেজটাকে টানতেছিলাম, সেই বল (Force) ছিল F, লাগেজের মধ্যে যা যা ছিল, সেগুলোর ভর (mass) হচ্ছে m আর a হচ্ছে আমার বলের কারণে লাগেজ যে ত্বরণ (acceleration) হইছিল, তা-ই লাগেজ টানার সময় আমি $F = ma$ পরিমাণ বল প্রয়োগ করছি। দেখছস, কোনো ঘটনা বা স্মৃতির সঙ্গে পড়াকে মেলাতে পারলে সেটা অনেক বেশি মনে রাখা সহজ ও মজার হয়ে যায়।

৫. টিচিং এনালজি টেকনিক

আমরা কোনো কিছু পড়তে বসলে এমনি এমনি পড়ে যাই। কিন্তু কাউকে বোঝানোর দরকার হলে আমরা অনেক উদাহরণ টানি। অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করে বোঝানোর চেষ্টা করি। তার মানে কাউকে কোনো কিছু বোঝানো লাগলে—কীভাবে বোঝাব, সেটা চিন্তা করতে একবার জিনিসটা সম্পর্কে ভালো করে দেখতে হয়। আর বোঝাতে গেলে আরও দুই-তিনবার রিভিশন দেওয়া হয়ে যায়। তাই আজকের পর থেকে কেউ কোনো কিছু বুঝতে চাক বা না চাক তাকে জোর করে হলেও বোঝাইতে যাবি। কারণ এই উছিলায় জিনিসগুলো তোর অনেক বেশি দিন মনে থাকবে।

৬. নেমোনিক ক্রিয়েশন টেকনিক

বাংলাদেশ সংবিধানে ১১টা ভাগ বা ধারা আছে। এই ভাগগুলো মনে রাখা একটু ডিফিকাল্ট। তাই পড়ার সময় প্রতিটি পয়েন্টের প্রথম অক্ষর খেয়াল করবি: (প) প্রজাতন্ত্র, (র) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, (ম) মৌলিক অধিকার, (নি) নির্বাহী বিভাগ, (আ) আইনসভা, (বি) বিচার বিভাগ, (নি) নির্বাচন, (ম) মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, (বা) বাংলাদেশের কর্ম বিভাগ, (স) সংবিধান সংশোধন, (বি) বিবিধ। এখন প্রথম অক্ষরগুলো দিয়ে মজার কিছু একটা বানায় ফেল। যেমন 'পরীমনি আবি নিমবা সবি' তাইলে পরীমনির নাম দেখলে এই ছোট লাইনটা সহজে মনে রাখতে পারবি। তারপর সেটা থেকে একটা একটা করে সংবিধানের ধারার নাম বের করে ফেলতে পারবি।

৭. টেক অ্যাডভানটেজ অব ক্লাস

পোলাপান ক্লাসে যায় ঠিকই, কিন্তু ভাব ধরে পেছনে বসে বসে পুটুর পুটুর আলাপ করে। অথচ ক্লাসেই অর্ধেক জিনিস বুঝে নেওয়ার চান্স থাকে। কোনো কিছু ক্লিয়ার না হলে স্যারকে প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে। তাই

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

আজকের পর থেকে ক্লাসের প্রথম বেঞ্চে বসবি। সিরিয়াসলি ক্লাসনোট তুলবি। না বুঝলে স্যারকে প্রশ্ন করবি। বাসায় গিয়ে জিনিসটা আধা ঘণ্টা সময় নিয়ে দেখে ফেলবি। তাহলে যেদিন পড়ানো হইছে, সেদিনই তোর অর্ধেক পড়া হয়ে যাবে। পরে আর অন্যের ক্লাসনোট ফটোকপি করতে, আরেকজনের কাছে বুঝতে যাওয়ার দরকার পড়বে না।

৮. ফ্রিকোয়েন্ট রিভিশন টেকনিক

মনে না থাকার সমস্যাকে লাইনে আনার সবচেয়ে ইফেক্টিভ উপায় হচ্ছে, যেদিন পড়ছিস, সেদিন ঘুমানোর আগে এই জিনিস ২০ মিনিটে রিভাইজ দিয়ে দিবি। পরের দিন আরেকবার দেখে ফেলবি। কিছুদিন পর আবার রিভিশন দিয়ে দিবি। তাহলে জিনিসগুলো বেশি দিন মনে থাকবে। এ কারণেই তুই তোর নাম, বাসার ঠিকানা, তোর ক্রাশের নাম ভুলস না। কারণ এই জিনিসগুলো ঘন ঘন বলতে হয় বিভিন্ন জায়গায়। আর বলতে বলতে অটো রিভিশন হয়ে যায়।

পড়া মনে রাখার টিপসগুলো তখনই ইফেক্টিভ হবে, যখন থেকে তুই এই টিপসগুলো কাজে লাগানো শুরু করবি। বারবার চেষ্টা করবি। যদি একটাও অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা না করস, তাহলে এতক্ষণ যে এত কিছু বললাম, এতে তোরও সময় নষ্ট। আমারও সময় নষ্ট।

বেশি নম্বরের সিক্রেট ঠেকায়, ডান্ডি খাওয়ার ভোজ

কোনো এক মহাজ্ঞানী বলেছেন, যে দেশে আপেলগাছ নাই, সে দেশে আপেল আর আপেলগাছতলার নিউটন জন্মাতে পারে না। তবে এ কথাটা মানতে রাজি না নুয়াজ। তার মতে, দেশে আপেলগাছ নাই তো কী হইছে? আমগাছ তো আছে। তাই সে প্রতিদিন আমগাছের নিচে বসে বসে ধ্যান করে। যদি আম পড়তে দেখে যুগান্তকারী কোনো সূত্র আবিষ্কার করে ফেলতে পারে আর কোনো সূত্র না পাইলেও অন্তত আমটা চিবাইয়া চিবাইয়া খাইতে পারবে।

তবে শেষ যেদিন তার মাথার ওপরে আম পড়ে ব্যথা পাইছিল, সেদিনই সে লিখে ফেলছে নুয়াজের নম্বর ফর্মুলা।

ফর্মুলাটা হচ্ছে, 'এই মহাবিশ্বের প্রতিটি পরীক্ষার ফলাফল স্মার্ট ও সিরিয়াস স্টুডেন্টদের আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ বল তাদের পড়ার জন্য ডেডিকেটেড সময়, মনে রাখার টেকনিক ও রিভিশনের ফ্রিকোয়েন্সির গুণফলের সমানুপাতিক এবং আশপাশের স্মার্টফোনসহ অন্য সব ডিস্ট্রাকশনের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।'

মনে কর, পরীক্ষার রেজাল্ট R, পড়ার জন্য ডেডিকেটেড সময় t, মনে রাখার টেকনিক m, রিভিশনের ফ্রিকোয়েন্সি f আর ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে d। তাহলে নুয়াজের সমীকরণ দাঁড়ায়—

$$R = \frac{tmf}{d^2}$$

এই যে পড়ালেখায় ইফেক্টিভ বানানোর ফর্মুলা, এইটা ক্লাসের যেকোনো ফাঁকিবাজ স্টুডেন্টের পরীক্ষার আগের রাতে পড়ার স্টাইল দেখলেই টের পাওয়া যায়। তারা পরীক্ষার আগের রাতে ১০০ ভাগ সিনসিয়ার হয়ে, মোবাইল বন্ধ করে, সব নোটপত্র গুছিয়ে একটা একটা জিনিস ধরে ধরে পড়ে। কেউ যদি তাদের মতো শুরু করে এবং সিরিয়াস পড়ালেখাটা শুধু পরীক্ষার আগের রাতে না; বরং তিন ঘণ্টা করে করে প্রতিদিন করে, পুরো সেমিস্টার ধরে, তাহলে সে ক্লাসের টপ ১০ জনের মধ্যে চলে আসবে।

কে কতক্ষণ পড়ছে, সেটা ইম্পরট্যান্ট হলেও সেটার সঙ্গে সঙ্গে ইম্পরট্যান্ট হচ্ছে, সে কতক্ষণ সময় ১০০ ভাগ মনোযোগ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

বোঝার চেষ্টা করছে। নাকি টেবিলে বসে দুই মিনিট পরপর কুল কুল কুলসুমের কথা চিন্তা করছে।

তাই পড়ার সময় কোন পার্টে কী বলছে, কোনটার পর কোনটা আসছে, সেটা খেয়াল করতে হবে। কোনো ছবি থাকলে সেটা এঁকে ফেলতে হবে। অনেক বেশি স্টেপ থাকলে স্টেপগুলোর নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে কিছু একটা বানানোর চেষ্টা করতে হবে। এ রকম টেকনিক যত বেশি অ্যাপ্লাই করতে পারবি, পড়া তত বেশি ইফেক্টিভ হবে।

একবার পড়লে দুনিয়ার কোনো মানুষেরই আজীবন পড়া মনে থাকবে না; বরং দুদিন না যেতেই ভুলে যাবে। তাই যখন নতুন কিছু শিখবি, টেবিল থেকে উঠে বাথরুমে গোসল করতে করতে মনে মনে রিভিশন দিয়ে দিতে হবে। তখন কোনো কিছু মনে করতে না পারলে, গোসল শেষ করে এসে একবার দেখে ফেলবি। পরের দিন আবার যখন অন্য কিছু পড়বি, তারপর সেটা পড়ার গ্যাপের মধ্যে এটা আবার ৫ মিনিট দেখে ফেলবি। তিন দিন পরে আবার একটু রিভিশন দিয়ে দেবি। তাহলে জিনিসটা অনেক দিন মনে থাকবে। খালি একবার দেখে বিদ্যাসাগরের মতো পাতা ছিঁড়ে ফেলে দিলে নম্বরের সাগরে না গিয়ে, শূন্যের মরুভূমিতে গিয়ে মারা খাওয়া ছাড়া আর কিছুই পাবি না।

ইফেক্টিভ পড়ার লাস্ট উপাদান হচ্ছে ডিস্ট্রাকশন। আশপাশে ডিস্ট্রাকশন যত বেশি, পড়া তত কম ইফেক্টিভ হবে। কিছুক্ষণ পরপর মোবাইলে নোটিফিকেশন এলে, একটু পরপর পাশের রুম থেকে কেউ ডিস্টার্ব করলে, টিভি দেখে চিৎকার মারলে, পড়ার ফোকাস, রেজাল্টের পরিমাণ ডিস্ট্রাকশনের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হবে।

> নুয়াজ সূত্র আবিষ্কার করার পর, উইরেকা বলে চিৎকার দিতে দিতে সেটা প্রিন্ট আউট করতে চলে গেছে। তবে প্রিন্ট আউট করতে যাওয়ার সময় নুয়াজ যে লুঙ্গি ফেলে দৌড় দিছিল, সেটা জানাজানি হয়ে গেলে, নুয়াজের কোনো দিনও বিয়ে হবে না।

ইংরেজি শেখার মাইক্রোডোজে, অস্থির পোজ

পড়াশোনা, এক্সট্রা কারিকুলাম, ইনকাম করা ছাড়াও সব সময় ইংরেজি শেখার জন্য আলাদা টাইম রাখত নুয়াজ। তবে তার কাছে ইংরেজি শেখা অনেকটা দাঁত ব্রাশ করার মতো। প্রতিদিন করতে হবে। না করলে মুখে দুর্গন্ধ চলে আসবে।

একইভাবে ইংরেজি শেখার চেষ্টা প্রতিদিন করতে হবে। নচেৎ ব্রেইনে জং ধরে যাবে।

তা ছাড়া ইংরেজি শেখার সিস্টেম বা প্রসেসের অভাব নাই। যেকোনো একটা ফলো করলেই হয়। তবে নুয়াজ নিজেও একটা ফর্মুলা বের করে ফেলছে।

সেটাই কিছুদিন আগে রিমনকে বলতেছিল—

তুই ইংরেজি পত্রিকা ঠিকমতো পড়তে পারস না। তবে ইংরেজি ধারাভাষ্যসহ ক্রিকেট খেলা ঠিকই বুঝতে পারস। ইংরেজি শেখার জন্য ইউটিউবে ভিডিও অন করলে মজা পাস না। কিন্তু ইংরেজি মারামারির ছবি, গানের ভিডিও, ট্রল ঠিকই এনজয় করস। মাগার স্যার ইংরেজিতে লেকচার দেওয়া শুরু করলেই তোর আত্মার পানি শুকিয়ে যায়। সব আগ্রহ গায়েবুল হাওয়া হয়ে যায়। তাই আজকের পর থেকে ইংরেজি শিখতে চাইলে এই স্টেপগুলো ফলো করবি—

স্টেপ-১ : ফোকাস অন দ্য প্রসেস

বাচ্চারা কীভাবে কথা শেখে? তারা কিন্তু মিনিং জানে না। আব্বু কী জিনিস, আম্মু কী জিনিস বোঝে না। ডিকশনারি খুলে মিনিং বের করার চেষ্টা করে না; বরং একই জিনিস বারবার শুনতে থাকে। ১০-১২ দিন একই জিনিস শুনতে শুনতে নিজে নিজেই একটা ধারণা তৈরি করে ফেলে—এই লোকটা যখন আসে, তখন লোকটাই আব্বু আব্বু বলে। আবার ওই মহিলাটা যখন আসে, তখন সে আম্মু, আম্মু বলে। এই শুনতে শুনতেই বাচ্চারা শিখে ফেলে।

আজকের পর তুইও ইংরেজি শেখার বেবি হয়ে যা। শুরুতেই অনলাইনে বা ইউটিউবে সার্চ দিয়ে একটা অডিও খুঁজে বের করে সেটা তোর মোবাইলে ডাউনলোড করে নিবি। খুব বড় না। তিন থেকে পাঁচ মিনিটের একটা

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

অডিও। তারপর হেডফোন কানে দিয়ে এই অডিওটা শুনবি। কমপক্ষে ২০ বার শুনবি। শুধু শুনবি। এক মাসে এই রকম আট-দশটা পাঁচ মিনিট সাইজের অডিও ২০-৩০ বার করে শুনবি। সেগুলো শুনতে শুনতে তোর কান ঝালাফালা হয়ে যাবে। তাও শুনবি। তখন তোর মুখস্থ হয়ে যাবে কোনটার কী উচ্চারণ। কোন লাইনের পর কোন লাইন।

স্টেপ -২ : তোতা পাখি

এত দিন যেগুলো শুনতেছিলি, সেগুলো আবার চালু করে দিয়ে শুধু প্রথম সেনটেন্সটা বলার চেষ্টা করবি। বলতে না পারলে, অডিও থামানোর দরকার নাই। রিপ্লে হয়ে আবার যখন আসবে, তখন আবার বলার চেষ্টা করবি। প্রথম সেনটেন্সটা এইভাবে বলার চেষ্টা করবি। প্রথম সেনটেন্স প্র্যাকটিস হয়ে গেলে, পরের সেনটেন্স বলার চেষ্টা করবি। এইভাবে প্রথম পাঁচটা সেনটেন্স প্র্যাকটিস হয়ে গেলে, আজকের জন্য খতম। কালকে আবার অডিওর মাঝখানের পাঁচটা সেনটেন্স ট্রাই করবি। তার পরের দিন লাস্টের পাঁচটা সেনটেন্স ট্রাই করবি।

স্টেপ-৩ : জাস্ট স্পিক

যে অডিওটা কানে হেডফোন লাগিয়ে অডিওর সঙ্গে সঙ্গে বলার চেষ্টা করছিলি, সেটাই পরের তিন দিন একটা-দুইটা সেনটেন্স বলবি, তবে এইবার কানের সঙ্গে হেডফোন না লাগিয়ে বলবি। নিজে নিজে বলার চেষ্টা করবি। যখন বলবি, তখন শুধু বলবি। অডিও থেকে কী রকম শুনছিলি, সেটার মতো উচ্চারণ হইছে কি না, সেটার মতো গ্রামার হইছে কি না, সেটার মতো স্পিড আসতেছে কি না, চিন্তা করতে যাবি না। শুধু মুখ দিয়ে গড়গড় করে শব্দ বের করতে থাকবি।

স্টেপ-৪ : বি অন্ধ, বি লজ্জাহীন

স্পিকিং শিখতে শুরু করলে প্রথম যেই কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, বি অন্ধ। বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করবি। তারপর যা মনে আসে, সেটা নিয়ে টানা পাঁচ মিনিট কথা বলতে থাকবি। সেকেন্ড যে কাজ করবি সেটা হচ্ছে, বি বধির। অর্থাৎ তুই যখন ইংরেজি বলতে শুরু করবি, তখন ঠিক বলতে পারতেছস কি না, উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে কি না, সেটা কানে ঢুকাবি না।

এই জিনিসটা কয়দিন পর ফ্রেন্ডদের সামনে প্র্যাকটিস করা শুরু করে দিবি। প্রথম প্রথম তোকে লজ্জাহীন হতে হবে। অন্যের সামনে ইংরেজি বলতে গিয়ে লজ্জা পাবি। মুখ দিয়ে শব্দ বের হতে চাইবে না। তারপরও চোখ বন্ধ করে তোতা পাখির মতো বলতে থাকবি।

স্টেপ-৫ : ওভারঅল স্ট্র্যাটেজি

আর কখনোই লিসেনিং, স্পিকিং, রিডিং, রাইটিং সব একসঙ্গে প্র্যাকটিস করতে যাবি না। জাস্ট লিসেনিং দিয়ে শুরু করবি। তারপর একটু একটু করে স্পিকিং করার চেষ্টা করবি। সময় থাকলে এক বছর শুধু লিসেনিং আর স্পিকিংয়ে ফোকাস রাখবি। তারপর এক বছর পর রিডিং নিয়ে চিন্তা করবি। আর রিডিং শুরু করার জন্য মোটা মোটা ইংরেজি বই বা নিউজপেপার নিয়ে বসার দরকার নাই। জাস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় কয়েকজনকে ফলো করা শুরু কর। যারা ইংরেজিতে পোস্ট দেয়।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

কখনোই পড়তে শুরু করলে সব শব্দের অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবি না; বরং প্রতিটি পড়া থেকে একটা শব্দ টার্গেট করবি। যেটা সেই ঘটনার সঙ্গে মিল আছে। তারপর সেটার আসল মিনিং খুঁজে বের করবি। এইভাবে একটা শব্দকে একটা ঘটনার সঙ্গে মিল রেখে মাথায় ঢোকালে সেই ঘটনার রেফারেন্স হিসেবে সেই শব্দ মনে রাখা অনেক সহজ হবে।

রাইটিং শিখতে চাইলে প্রথমেই চেষ্টা করবি ইংরেজিতে চ্যাট করতে। প্রথম প্রথম সমস্যা হবে। শব্দ খুঁজে পাবি না। গ্রামার ঠিক থাকবে না। বানানে ভুল হবে। এর মধ্যেই চেষ্টা চালিয়ে যাবি।

আর রিলাক্স হতে চাইলে দু-একটা স্লো ইংরেজি মুভি দেখা শুরু করবি বা ইংরেজি গল্পের বই ধরবি। যেগুলোতে অনেক কথা বলা আছে, কিন্তু বেশি মারামারি নাই। আর সম্ভব হলে তোর মতো আরেকজনকে খুঁজে বের করবি যে ইংরেজি শিখতে চায়। এ ছাড়া স্পিকিং, লিসেনিং, রাইটিংয়ের জন্য ভালো ভালো মোবাইল অ্যাপ আছে, সেগুলো ইনস্টল করে নিবি।

স্টেপ-৬ : ইংরেজি শেখার মাইক্রোডোজ

ইংরেজি শেখার এই মিশন একটা লম্বা মিশন। যেটা করতে অনেক লম্বা সময় লাগবে। অনেক বার লজ্জায় পড়তে হবে। অনেক বার কথা বলতে গেলে শব্দ খুঁজে পাবি না। তারপরেও একটু একটু করে ইংরেজির ডোজ নিতে হবে। দরকার হলে ছোট ছোট করে মাইক্রোডোজ নিবি।

এই মাইক্রোডোজকে বলে, মাইক্রোডোজ অব ডিসকমফোর্ট; অর্থাৎ যে কাজটা করতে তুই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছস না। সেটা মাইক্রোডোজ হিসেবে একটু একটু করে করতে থাকাটাই মাইক্রোডোজ অব ডিসকমফোর্টের জন্য এফোর্ট দেওয়া। আর ডিসকমফোর্টের পেছনে এফোর্ট দিলে, ডিসকমফোর্ট কনভার্ট হয়ে কমফোর্ট হয়ে উঠবে।

আর শেষ কথা হচ্ছে, ইংরেজিতে ভালো করার প্রসেস জানাটা কোনো সিক্রেট না। আসল সিক্রেট হচ্ছে প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করতে পারা। ডিসকমফোর্ট লাগলেও এফোর্ট দিতে পারাটা।

কড়া পড়া ক্লিনিক

কিছুক্ষণ ধরে নুয়াজ রিমনের সঙ্গে পড়া মনে রাখার টেকনিক, ইংরেজি শেখার টেকনিক নিয়ে আলোচনা করেছে। এখন তুই নিজেও যদি পড়ালেখায় ভালো না হওয়ার প্যারার মধ্যে থাকিস, তাহলে পড়া সিস্টেম করার কড়া ক্লিনিকে চলে যা। সেখানে অনেকগুলো চেকপয়েন্ট দেওয়া আছে। প্রতিটা চেকপয়েন্টের ডানপাশে একটা করে পানির ফোঁটা দেওয়া আছে। যদি বামপাশের কথাগুলো তোর জন্য পুরোপুরি সত্যি হয়, তাহলে পানির ফোঁটার পুরোটা ভরাট করবি। আর যদি আধা সত্য হয়, তাহলে অর্ধেক ভরাট করবি। আর যদি একদমই সত্যি না হয়, তাহলে কিছু ভরাট করার দরকার নাই। আর যখন একটা পানির ফোঁটা ভরাট করবি, সেটা সঙ্গে সঙ্গে ডানপাশের গ্লাসে পানির ফোঁটাও ভরাট করে ফেলবি।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

আমি নিয়মিত কিছু না কিছু পড়ি বা শেখার চেষ্টা করি

আমি ইংরেজি শেখার জন্য রেগুলার টাইম দিই

দরকার হলে কোনো কিছুতে ১০০% মনোযোগ দিতে পারি

পড়া মনে রাখার দুই বা তার বেশি টেকনিক অ্যাপ্লাই করি

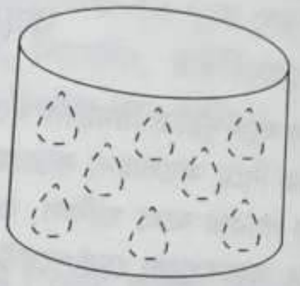

আমি জানি পাস করার পর আমি কী হতে চাই

আমার ইমোশনের ওপর আমার যথেষ্ট কন্ট্রোল আছে

পড়ালেখার বাইরে অন্তত একটা জিনিসে আগ্রহ আছে

বেলাইনে যাওয়া শুরু করলে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি

ওপরের গ্লাসে পানির ফোঁটা ভরার পরিমাণ দেখেই বলে দিতে পারবি, তোর ফিউচার কতটা ভরা আর কতটা খালি।

না হয়ে দিগ্‌ভ্রান্ত, ৩ সেকেন্ডে সিদ্ধান্ত

ক্যানটিনে খাচ্ছে নুয়াজ। একটু পরে এল রিমন। রিমনের ক্লাসমেট অভিসহ আরও কয়েকজন। তারা এসেই কিছুক্ষণ হায়-হ্যালো করার পর, অভি নুয়াজকে জিজ্ঞেস করল :

—ভাইয়া, ডিসিশন কীভাবে নিতে হয়?

না বুঝে আদ্যোপান্ত, কেমনে বলব, কিসের সিদ্ধান্ত?

—না মানে, যেকোনো সহজ বা কঠিন সিদ্ধান্ত কীভাবে নিতে হয়?

তখন নুয়াজ বলতে শুরু করল—

একটা সিচুয়েশনের কথা চিন্তা কর। ধর তুই ক্লাসে বসে আছিস। স্যার জিজ্ঞেস করল, শ্রীলঙ্কার রাজধানী কোথায়? তুই জানস উত্তরটা কী, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলস না; বরং চারদিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখস অন্য কেউ হাত তুলছে কি না। অন্য কাউকে হাত তুলতে না দেখে কিছুটা কনফিউশনে পড়ে গেছস—হাত তুলবি কি, তুলবি না। একইভাবে সকালবেলা ঘুম ভাঙল। তুই বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা করলি—এখন উঠব? এত তাড়াতাড়ি উঠব? নাকি আরও পাঁচ মিনিট ঘুমাব? এ রকম গড়িমসি করতে করতে কখন যে চোখ বন্ধ হয়ে গেছে তুই টেরই পাসনি। পরে যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখলি দুই ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।

ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন

এই যে ক্লাসে হাত তুলব, কি তুলব না—এই সিদ্ধান্তগুলো কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিতে হয়। দেরি করলে ফসকে যায়। তাই সিদ্ধান্তগুলোকে বলা হয় ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন। এই সব ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন যদি ৩ সেকেন্ডের মধ্যে না নিস, কনফিউজড হয়ে যাস কিংবা ৩ সেকেন্ডের বেশি চিন্তা করতে যাস, তাহলে আর কাজটা করা হয় না।

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবি। তোর যে কদিন পরে পরীক্ষা, সেটার জন্য যে পড়ালেখা করতে হবে, এইটা কিন্তু ঠিকই প্রতিদিন তোর মনে আসে। কিন্তু তুই সিদ্ধান্ত নিতে গড়িমসি করস। আচ্ছা, আজকে শুরু করব, নাকি কালকে থেকে। এই সাবজেক্ট শুরু করব, নাকি অন্য সাবজেক্ট। এই সব গড়িমসি করতে ৩ সেকেন্ডের বেশি সময় চলে যায়। তারপর অন্য কিছু

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

মাথায় চলে আসে। আর পড়ার জিনিসটা মাথা থেকে চলে যায়। তোর আর পড়া শুরু করা হয় না।

তাই আজকের পর থেকে যখনই কোনো কিছু করার কথা মাথায় আসবে তিন সেকেন্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাবি। সঙ্গে সঙ্গে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সামনের দিকে শক্ত করে টেনে ধরে বলবি, ইয়েস, আমি এইটা এখন করব। টিচার প্রশ্ন করছে, তুই উত্তর জানস। তিন সেকেন্ডের মধ্যে কোনো দিকে না তাকিয়ে হাত তুলে ফেলবি। পড়ার কথা মাথায় আসছে। তিন সেকেন্ডের মধ্যে জায়গা থেকে উঠে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলবি, ইয়েস, আমি এখন পড়ব। তারপর বই খুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিবি। ৩ সেকেন্ডের মধ্যে তুই যদি জায়গা থেকে উঠে না দাঁড়াস, তাহলে তুই আর কাজটা করবি না।

এই ৩ সেকেন্ড অনেকটা গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়ার মতো। ৩ সেকেন্ডের মধ্যে ইঞ্জিনে স্পার্ক না করলে গাড়ি চলবে না। একইভাবে তোর কোনো কিছু করার কথা মনে এলে তুই যদি ৩ সেকেন্ডের মধ্যে কাজটা শুরু করে না দিস, তাহলে অন্য চিন্তা এসে তোকে ডাইভার্ট করে ফেলবে।

লাইফস্ট্যান্ড ডিসিশন

আমাদের সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি দেয় লাইফ ডিসিশনগুলো। যেগুলোর এফেক্ট বেশিদিন থাকে। যেমন ধর, পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হইছে, আরেকবার পরীক্ষা দেব, নাকি এই রেজাল্ট নিয়ে চালিয়ে যাব। অথবা ওর সঙ্গে প্রেম ছেড়ে দিয়ে তার বান্ধবীকে প্রপোজ করব? নাকি, এইটাই ভালো। অথবা পড়ালেখা তো শেষ এখন কি হায়ার স্টাডি করার চেষ্টা করব, নাকি বিসিএস দেওয়ার চেষ্টা করব। এ রকম সিচুয়েশনে ডিসিশন নেওয়া টাফ। যেদিকেই যাবি কিছু না কিছু খারাপ হওয়ার চান্স আছে। আবার কিছু ভালো হওয়ারও চান্স আছে। এ রকম ক্ষেত্রে তোকে তিনটা কাজ করতে হবে—

১. মিনিমাম তিনজন মানুষের সঙ্গে তোর অপশনগুলো নিয়ে কথা বলবি। ওরা কী বলছে, সেটা চিন্তা করবি।

২. ম্যাক্সিমাম তিন দিনের মধ্যে তোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ বেশির ভাগ সময় আমরা সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করি। দিনরাত এইটা হবে, না ওইটা

হবে—এমন অ্যানালাইসিস করতে করতে নিজেদের ভেতরে অ্যানালাইসিস প্যারালাইসিস তৈরি করে ফেলি। তাই তোর সিদ্ধান্ত ফাইনাল করার একটা ডেডলাইন থাকবে। তার মধ্যে ভালো হোক, খারাপ হোক একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হবে।

৩. তারপরও সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে একটা সাদা কাগজ নিয়ে বসবি। তারপর ডানের কলামগুলোতে যে অপশন আছে, সেগুলোর নাম লিখবি। এরপর ক্রাইটেরিয়া কলামে একটার পর একটা করে বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া লিখবি। ডানপাশের কলামে ১ থেকে ১০-এর মধ্যে নম্বর দিবি। যদি কোনো একটা জিনিস খুব ভালো হয় তাহলে ১০ দিবি। আর খুব জঘন্য হলে ১ বা ২ দিবি। এভাবে একটার পর একটা ক্রাইটেরিয়া লিখতে থাকবি।

একেকজনের সিচুয়েশন অনুসারে ক্রাইটেরিয়া, ক্রাইটেরিয়ার সংখ্যা, স্কোরিং একেক রকম হতে পারে। এভাবে সবগুলো স্কোরিং করা হয়ে গেলে নিচে যোগ করে দিবি। যেই অপশনের পয়েন্ট বেশি আসবে। সেটাই তোর সিদ্ধান্ত।

NO	ক্রাইটেরিয়া	প্রথম অপশন	দ্বিতীয় অপশন
১	আমি কতটা মরিয়া হয়ে চাচ্ছি		
২	ফ্যামিলি কতটা সাপোর্ট দেবে		
৩	আমার প্রোফাইল কেমন এবং আমার কনফিডেন্স লেভেল কেমন		
৪	ফ্রেন্ড বা অন্যদের সাপোর্ট কেমন পাব		
৫	টাকাপয়সার দৃষ্টিকোণ থেকে কেমন হবে		
	টোটাল স্কোর		

পারফেক্ট ডিসিশন

পারফেক্ট ডিসিশন বলতে কিছু নাই। দুনিয়ার কেউই গ্যারান্টি দিতে পারবে না যে এই ডিসিশন নিলে তুই ১০০ ভাগ সফল হবি।

তবে সঠিক সিদ্ধান্ত না থাকলেও যেটা আছে সেটা হচ্ছে, সিদ্ধান্তকে সঠিক বানানো। তাই একটা ডিসিশন নেওয়ার পর, কেন এই ডিসিশন নিলাম।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

অন্য ডিসিশন নিলে রসগোল্লা পাওয়া যেত, সেগুলো চিন্তা করতে যাবি না; বরং ভালো হোক বা খারাপ হোক, আমি ডিসিশন নিয়ে নিলাম। এখন আমি কী কী করলে এই জায়গা থেকে সামনে এগোতে পারি, সময়গুলোকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে পারি। আর সব সময় মনে রাখবি— Protecting a decision will never make your situation better. So, if needed adjust your next action to make your life better.

কোথাও চান্স পাইনি, হাতে হারিকেন ছাড়িনি

ডিসিশন মেকিংয়ের আলোচনা শেষ হওয়ার পর অভি বলল—

যে কারণে ডিসিশন মেকিংয়ের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম, সেটা হচ্ছে আমার এই ছোট ভাইয়ের জন্য। ও এবার ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ভালো কোথাও চান্স পায়নি। তাই হেব্বি কনফিউশনে আছে। এখন যেখানে ভর্তি হইছে, সেখানে কন্টিনিউ করবে, নাকি আরেকবার ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করবে। নাকি বেসরকারিতে ভর্তি হবে? আপনি কী বলেন?

তখন নুয়াজ অভির ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল—

তুমি যদি ২৩ বছর বয়সে ফ্রিল্যান্সিং করতে চাও অথবা ২৭ বছর বয়সে বিসিএস পরীক্ষায় টিকতে চাও কিংবা ৪০ বছর বয়সে স্টাবলিস্ট বিজনেস পারসন হতে চাও, এই তিনটার কোনোটাই করার জন্য কেউ জানতে চাইবে না, তুমি কোন ভার্সিটিতে পড়েছ বা কোন সাবজেক্টে পড়েছ। একই কারণে সাকিব আল হাসান কোন ভার্সিটিতে পড়েছে, জেমস বা আইয়ুব বাচ্চু কোন সাবজেক্টে পড়েছে, সেটা কেউ জানতে চায় না। সো, তুমি কোন ভার্সিটিতে চান্স পাইছ, কোন সাবজেক্টে পড়তে যাচ্ছ, সেটা নিয়ে এত টেনশনের কী আছে?

শুন, আমাদের লাইফটা ২০ বছরের না। ৩০ বছরেরও না; বরং ৭০ বছরের একটা লাইফ। এই ৭০ বছরের লাইফে ২০ বছর বয়সে কী হইছিল, সেটার তেমন সিগনিফিক্যান্ট এফেক্ট ৪০ বা ৫০ বছর বয়সে গিয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া কোনো ভার্সিটিতে ঢুকতে পারলেই সেই ভার্সিটি তোমার ফিউচার গড়ে দেবে, তা কিন্তু নয়; বরং যে ভার্সিটিতেই যাও না কেন, নিজের লাইফ নিজেকেই গড়ে নিতে হবে। সে জন্যই একই ভার্সিটির সবার ক্যারিয়ার, সবার ফিউচার সেইম হয় না। কারও বেশি ভালো হয়, কারও কম ভালো হয়, আবার কারও কারও লেজেগোবরে অবস্থা হয়ে যায়।

তবে ভালো ভার্সিটিতে চান্স পেলে অবশ্যই ভালো। তাহলে প্রেমের বাজারে, দাওয়াতের সমাজে, পাত্রপাত্রী চাই কম্পিটিশনে, চাকরির ইন্টারভিউতে কল পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে থাকতে পারবে। তবে ভালো ভার্সিটিতে পড়ছে শুনলেই যে চাকরির ইন্টারভিউতে চেয়ার ছেড়ে দিয়ে বলবে, ওস্তাদ, আপনারে কোম্পানির CEO বানাই দিলাম, তা কিন্তু না। সে যেই ভার্সিটিতেই

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

পড়ুক না কেন তাকে ইন্টারভিউতে ভালো করে, তার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েই চাকরি পেতে হবে।

কোনো কারণে ভালো ভার্সিটি না পেলে, তোমার কাছে চারটা অপশন আছে।

- এক. কেন ভালো ভার্সিটি পেলাম না, সেটা নিয়ে কান্নাকাটি করা।
- দুই. কোথাও ভর্তি হয়ে সেকেন্ড টাইম ট্রাই করা।
- তিন. কোথাও ভর্তি না হয়ে সেকেন্ড টাইম ট্রাই করা।
- চার. দেশের বাইরে আন্ডারগ্রেড করার চেষ্টা করা।

তবে দেশের বাইরে যেতে হলে তোমার ফ্যামিলির ফাইনান্সিয়াল সাপোর্ট কিছু না কিছু থাকতে হবে এবং দেশের বাইরে পড়তে যাওয়ার প্রসেসিং করতে তোমার মিনিমাম দেড় বছর লেগে যাবে। তবে এ দিকে কোথাও ভর্তি হতে পারলে আমি বলব, কখনোই চাইবে না, যেখানে ভর্তি হয়ে আছ সেখানে ঠিকমতো ক্লাস করব আবার একই সঙ্গে সেকেন্ড টাইম অ্যাডমিশন দেব। তাহলে ইয়ার ড্রপ করা ছাড়া দুইটার কোনোটাই ঠিকমতো হবে না।

আর যদি পুনরায় অ্যাডমিশন পরীক্ষা দেওয়ার ডিসিশন নিতে চাও, তাহলে আগে দুই মাস দিনরাত পড়ালেখা করে, তুমি যে চেষ্টা করতে পারবে, লেগে থাকতে পারবে, সেই প্রমাণ দাও। নচেৎ যেখানে চান্স পাইছ বা কোনো বেসরকারিতে ভর্তি হওয়া সম্ভব হলে, সেখানে ভর্তি হয়ে ভদ্র বাচ্চার মতো ক্লাস করা শুরু করে দাও।

কখনোই শুকনা স্বপ্ন কিংবা অতীতের ব্যর্থতা নিয়ে ক্লাস করতে যাবে না। ইয়ার ড্রপ হোক বা অপছন্দের সাবজেক্ট হোক, যাদের সঙ্গে ক্লাস করতেছ, তারাই তোমার ফ্রেন্ড। যে সাবজেক্টে পড়তে শুরু করেছ, সেটাই তোমার পরিচয়। সেটা মনেপ্রাণে ধারণ করতে পারলে, সেখান থেকেই সামনে এগোতে পারবে।

ইন্টারনেটের এই যুগে ভালো ভার্সিটিতে কী কী পড়াচ্ছে, সেটা জানা কোনো সমস্যাই না। সে জন্য বাংলাদেশের আবুজর গিফারী কলেজে ভর্তি হয়েও তুমি হার্ভার্ড, এমআইটির ক্লাসের ফুল লেকচার ভিডিও বাসায় বসে বসে দেখতে পারবে। তাই মনেপ্রাণে সংকল্প নিয়ে নেমে পড়লে তুমি যেকোনো ভার্সিটির যেকোনো সাবজেক্টে ভর্তি হয়েই ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্কিল ডেভেলপ করতে পারবে।

চাকরির মায়েরে বাপ, স্টুডেন্ট লাইফে স্টার্টআপ

এরপর রিমন বলল, ভাই, বিজনেস, স্টার্টআপ সম্পর্কে একটু বলেন। আমি এন্ট্রাপ্রেনিয়ার হতে চাই। কীভাবে শুরু করব—

বিজনেস শুরু করলে এক দিনে বা এক বছরে তুই লাখপতি হয়ে যাবি না। ছয় মাসে গাড়ি-বাড়ি হয়ে যাবে না। তা ছাড়া বিজনেসে স্ট্যাবিলিটি বলতে কিছু নাই। কখনো বিজনেস ভালো যাবে, আবার কখনো দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম হবে। এমন রোলার কোস্টারের মতো জার্নির সঙ্গে লাইফ অ্যাডজাস্ট করে চালাতে পারলে বিজনেসের কথা চিন্তা কর। নচেৎ চাকরিই তোর জন্য ভালো। মাসে মাসে নির্দিষ্ট একটা স্যালারি ব্যাংকে জমা হবে, সেটা দিয়েই চলতে পারবি। এরপরেও বিজনেস করতে চাইলে নিচের কয়েকটা জিনিস মনে রাখবি।

ইউনিক আইডিয়া

তোকে ইউনিক কিছু করতেই হবে এমন কোনো কথা নাই। যেমন ধর গুগল, ফেসবুক কিংবা ইউটিউব কোনোটাই কিন্তু ইউনিক আইডিয়া না। গুগলের আগে আরও ১০-১২টা সার্চ ইঞ্জিন ছিল। গুগল, আগের সার্চ ইঞ্জিনের চাইতে অনেক ইফিশিয়েন্ট একটা সার্চ ইঞ্জিন বের করছে। ফেসবুকের আগেও কয়েকটা সোশ্যাল মিডিয়া ছিল। সো, তোকে সব সময় যে ইউনিক আইডিয়া নিয়েই বিজনেস শুরু করতে হবে, এমন কোনো কথা নাই। হ্যাঁ ইউনিক আইডিয়া হলে ভালো। তবে সব সময় যে ইউনিক আইডিয়া লাগবে এমন কোনো কথা নাই। জাস্ট পুরোনো কোনো আইডিয়াকে আরেকটু ভালোভাবে করে দিতে পারলেও সেটা দিয়ে চমৎকার বিজনেস করে ফেলা সম্ভব।

কোন বিজনেস করব?

দুনিয়ার সবকিছুই বিজনেস। কিন্তু তুই কোন বিজনেস করবি, সেটা খুঁজে বের করার চারটা উপায় আছে।

উপায়-১ : জাস্ট ১০ মিনিট সময় নিয়ে বস। চিন্তা করে দেখ তোর ফ্রেন্ড যারা আছে, তারা এই সপ্তাহে কোন কোন জিনিসের পেছনে টাকা খরচ করছে। অথবা তোর ফ্যামিলি বা আশপাশের লোকজন কোন প্রবলেমটা ফেইস করতেছে, সেগুলো একটা Excel ফাইলে লিখে ফেল।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

উপায়-২ : তোর আশপাশের মানুষ এমন কী কী করে যেটা অনেক প্যারা দেয়। আর তুই সেটাকে ওয়েবসাইট বানিয়ে বা অ্যাপ বানিয়ে ডিজিটালাইজড করে ফেলতে পারবি। মানুষের প্যারা নিরাময় করে ফেলতে পারবি। সেগুলো এক্সেলে লিখে ফেল।

উপায়-৩ : ইন্টারনেট সার্চ দিয়ে বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা ভিডিও দেখে বের করবি। কোন কোন প্রোডাক্ট বা সার্ভিস বিদেশে আছে, আমাদের দেশে নাই বা অন্য এলাকাতে আছে কিন্তু তোর এলাকাতে নাই, তুই সেটাও তোর এক্সেলে লিখে ফেল।

উপায়-৪ : তুই অনেক চিন্তা করে করে, নিজে নতুন একটা জিনিস বের করতে পারস। যেটা মানুষের লাইফ চেইঞ্জ করে দিতে পারে। সেই ক্রিয়েটিভ আইডিয়াও বিজনেস হতে পারে। সেটাও লিখে ফেল।

কীভাবে শুরু করব?

স্টেপ-১ শর্টলিস্ট : প্রথমেই তুই যে পসিবল বিজনেসের লিস্ট বানাইছস, সেখান থেকে একটা একটা করে কমাতে শুরু কর। কোন প্রবলেম তুই সলভ করতে পারবি? কোন জিনিসটা ডিমান্ড ভালো। এইটা করে তুই তোর বিশাল লিস্ট থেকে তিনটা জিনিসের ছোট একটা লিস্ট বানাবি।

স্টেপ-২ ফাইনালাইজ : তুই যে তিনটা জিনিস শর্টলিস্ট করছস, সেগুলো করতে কী করা লাগবে বা কোথায় পাওয়া যায়, খরচ কত পড়বে, এই সব খোঁজ নিবি। যারা এই টাইপের সার্ভিস দিচ্ছে, এমন কেউ আছে কি না। তাদের কী সমস্যা। এই টাইপের জিনিস যারা কেনে, তাদের কী সমস্যা। প্রথমে জাস্ট শুধু খোঁজখবর নিবি। তারপর চিন্তা করে দেখবি এই রিলেটেড প্রোডাক্ট বা সার্ভিস তুই দিতে পারবি কি না। তারপর তোর তিনটা লিস্ট থেকে একটা সিলেক্ট করবি।

স্টেপ-৩ স্টার্ট স্মল : বিজনেস করার জন্য তোকে প্রথমেই সবকিছু নিয়ে নামতে হবে না। ওয়েবসাইট, গোডাউন বানিয়ে, বিজনেস কার্ড ছাপিয়ে, এমনকি অফিস ভাড়া করে ফেলারও দরকার নাই। জাস্ট মিনিমাম কিছু স্যাম্পল প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারলে ভালো। না পারলেও সমস্যা নাই। জাস্ট আইডিয়া নিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দে।

স্টেপ-৪ ফাইন্ড কাস্টমার : মোস্ট ইম্পরট্যান্ট কাজ হচ্ছে কাস্টমার খুঁজে বের করা। অনেক মানুষকে যদি জিজ্ঞেস করস, ভাই, আপনি এইটা কিনবেন কি না। তারা বলবে হ্যাঁ কিনব। তারপর তুই যখন প্রোডাক্ট নিয়ে তাদের সামনে আসবি। তখন বলবে আজকে না, কালকে। এইটা না, ওইটা। সো, দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে অন্যের পকেট থেকে টাকা বের করা।

স্টেপ-৫ ম্যানেজ মানি : কয়েকটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস বিক্রি করতে পারলে এইগুলো থেকে যে প্রফিট আসবে, সেটা দিয়ে কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করে ফেলবি। আর কখনোই বিজনেসের টাকা দিয়ে বন্ধুদের ট্রিট দিতে যাবি না। বিজনেসের টাকা থাকবে সম্পূর্ণ আলাদা একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে।

স্টেপ-৬ বি কম্পিটিটিভ : বিজনেসের মেইন শক্তি হচ্ছে কম্পিটিশন। যে প্রতিনিয়ত গুণগত প্রোডাক্ট বা সার্ভিস দিতে পারবে, কাস্টমারকে হ্যাপি রাখতে পারবে, সে বিজনেসে টিকে থাকবে। বাকিরা আসবে-যাবে। আর যে ধৈর্য ধরে, নতুন নতুন আইডিয়া বের করে তার রোলার কোস্টারের জার্নিতে লেগে থাকবে, সে-ই শেষ হাসি হাসবে।

স্টুডেন্ট লাইফে বিজনেস

স্টুডেন্ট লাইফে স্কিল ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে বিজনেস মিলায় দিতে পারলে তো কোনো কথাই নাই। ধর তুই ভিডিও এডিটিং শিখলি। তারপর কার কার ভিডিও এডিটিং লাগবে তাদের প্রথম কয়েকটা ফ্রি ফ্রি করে দিলি। এরপর একটু একটু করে টাকা চার্জ করতে শুরু করে দিলি। একইভাবে তুই হয়তো প্রোগ্রামিং করতে চাইছস। প্রোগ্রামিং শিখতে শিখতে বাইরের মানুষের কাজ করা শুরু করে দিলি। এরপর আরও বড় কাজ পেলে কয়েকজনকে টিম মেম্বার বানিয়ে ফেলবি। ব্যস, তোর বিজনেস শুরু হয়ে গেল। এই যে চারপাশে এত এত ওয়েডিং ফটোগ্রাফি দেখস, তারা সবাই একা একা টুকুর টুকুর করে শুরু করছে। তারপর করতে করতে এখন ওয়েডিং ফটোগ্রাফি কোম্পানি হয়ে গেছে।

বিজনেস যদি করতেই চাস, ঘোমটা দিয়ে লাভ নাই। আজকেই নেমে পড়। আজকেই শুরু করে দে। ২-৩ বছর নাকানি-চুবানি খাওয়ার পর দেখবি ছোট্ট একটা অবস্থান দাঁড়িয়ে গেছে।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

টাইম ম্যানেজমেন্টের সার্জারিতে লাগবে না চেকআপ

ভাইয়া, ডিপার্টমেন্টের পড়ালেখার প্রেসার, টিউশনি, অর্গানাইজেশনে ভলান্টিয়ারিং, তার ওপরে স্টার্টআপ নিয়ে চিন্তা। এত কিছু করার টাইম কই পাব। দিনে তো ২৪ ঘণ্টা সময়। ৪৮ ঘণ্টা না।

— (নুয়াজ হাসতে হাসতে বলল)। আচ্ছা বলতেছি—

১. ইনফরমেশন ডায়েটিং, মিডিয়া ফাস্টিং

দুই বছর আগে যেই যেই হট নিউজ নিয়ে মাথা গরম করছিলি, সেগুলোর কোনোটাই আজকে তোর মনে নাই। একইভাবে আজকে যেসব হট নিউজ শুনে কান গরম করতেছস, এক বছর পরে এগুলোর কোনোটারই ভ্যালু থাকবে না। তাই আজকের পর থেকে ইনফরমেশন ডায়েটিং শুরু করে দিবি। যেসব ইনফরমেশন ছয় মাস, এক বছর পরে কোনো কাজে লাগবে না, সেগুলো কানে দিয়ে ঢোকাতে যাবি না।

আর মাঝেমধ্যে মোবাইল ফাস্টিংয়ের মতো করে মিডিয়া ফাস্টিং করবি। অর্থাৎ সকাল থেকে শুরু করে রাত ১২টা পর্যন্ত ফেসবুক, ইউটিউব, এ রকম সব সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ১০০ ভাগ রোজা। সারা দিনে একবারের জন্যও টাচ করতে যাবি না। তাইলে এই ইনফরমেশন ডায়েটিং আর মিডিয়া ফাস্টিং করতে করতেই তোর সারা দিনের টাইম ডাবল হয়ে যাবে।

২. ব্যাচিং

ধর, আজকে তুই একটা জামা গায়ে দিলি, সেটা একটু ময়লা হয়ে গেছে। বাসায় এসে তুই সঙ্গে সঙ্গে এই জামাটা ধুয়ে ফেলবি না; বরং এই জামাটা রেখে অন্য আরেকটা জামা পরবি। সেটাও ময়লা হয়ে গেলে অন্য আরেকটা পরবি। এভাবে বেশ কয়েকটা জামা ময়লা হওয়ার পর সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ময়লা জামা-কাপড়গুলো একসঙ্গে নিয়ে ধুতে যাস। তার মানে জামা ধোয়ার কাজগুলো তুই ব্যাচিং করতেছস।

এখন চিন্তা কর যে তুই পড়তেছিলি। এমন সময় একটা নোটিফিকেশন এল। তুই সেটা চেক করতে এক মিনিট বা পাঁচ মিনিট, যতক্ষণ সময়ই লাগাস না কেন, তুই আগে যে ফ্লোতে ছিলি সেটা হারিয়ে যাবে। এমনকি

কোন জিনিসটা পড়তেছিলি, সেটাও অর্ধেক ভুলে যাবি। তাই আজকের পর থেকে যখন পড়তে বসবি, তখন মোবাইল সাইলেন্ট করে অন্য রুমে রেখে দিবি। তারপর পড়ার সময় যে নোটিফিকেশনগুলো আসছে, সেগুলো ক্লাসে যাওয়ার পথে হাঁটতে হাঁটতে চেক করে ফেলবি। ব্যস, তোর সবগুলো নোটিফিকেশন একসঙ্গে ব্যাচিং করা হয়ে গেল।

৩. প্যারালালাইজেশন

ধর তুই বাসে করে কোথাও যাচ্ছস। প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যামে আটকে বসে আছস। এখন ট্রাফিক জ্যামে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তুই যদি ব্যাগ থেকে বই বা খাতা খুলে পায়ের ওপরে রাখস, বাসের কন্ডাক্টর মামা কিন্তু বই খোলার অপরাধে তোকে বাস থেকে নামিয়ে দেবে না। একইভাবে রিকশায় করে কোথাও যাওয়ার পথে কিংবা সেলুনে চুল কাটার সময় কিংবা টিউশনিতে স্টুডেন্টকে অঙ্ক করতে দিয়ে তোর সামনে যদি অন্য একটা খাতা খোলা থাকে তাহলে একটা কাজ করতে করতে তোর অন্য আরেকটা কাজ হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে প্যারালালাইজেশন। একটা কাজ করতে করতে সেই চান্সে আরেকটা কাজ করা হয়ে যাবে।

৪. ক্লেইম এজ মিনিমাম এজ ফাইভ মিনিটস

ধর তুই বাসের জন্য অপেক্ষা করতেছস। স্যারের সঙ্গে দেখা করার জন্য তার রুমের সামনে অপেক্ষা করতেছস। এই ওয়েটিং টাইমগুলো কাজে লাগাতে হবে। হয়তো আগের রাতের পড়া মনে মনে রিভিশন দিয়ে দিলি বা মোবাইলের মধ্যে কোনো পিডিএফ খুলে পড়তে শুরু করে দিলি। একইভাবে গোসল করতে গিয়ে, বাথরুম করার সময়, চা দোকানে চা খাওয়ার সময় কিংবা সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় ওঠার সময়। নেক্সট কী কী করবি, সেটার আউটলাইন বানিয়ে ফেললি কিংবা চট করে আজকের দিনের লাইফস্ক্যান করে ফেললি। তাহলে ৫ মিনিট করে করে সারা দিনে দেড়-দুই ঘণ্টা এক্সট্রা পেয়ে যাবি।

৫. ফিউচার বিল্ডিং ভ্যাকেশন

বছরে বেশ কয়েকটা লম্বা ছুটি পাই আমরা। যেমন ধর দুইটা ঈদের ছুটি, পূজার বন্ধ, সেমিস্টার গ্যাপ। এই সব ছুটির সময়কে দুই ভাগ করে

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

ফেলবি। অর্ধেক সময়ে এনজয় করবি। মাস্তি করবি। আর বাকি অর্ধেক সময় তোর একটা স্পেশাল টার্গেট থাকবে। হয়তো এক বন্ধের সময় তুই ফটোশপ শিখে ফেলবি। আরেক বন্ধের সময় তুই ভিডিও এডিটিং শিখলি। অন্য বন্ধের সময় টার্গেট নিলি যে বেসিক প্রোগ্রমিং শিখে ফেলবি। তার মানে প্রতিটা ভ্যাকেশনে এনজয় করবি আবার একটা জিনিস তোর লাইফে যোগও করে ফেলবি।

৬. ম্যানেজ অনলি ৩ ঘণ্টা

আমার যখনই টাইম ম্যানেজমেন্ট করার চিন্তা করি, তখনই ঠিক করে ফেলি যে দিনের ২৪ ঘণ্টা সময়, প্রতিটা মিনিট, প্রতিটা ঘণ্টা ম্যানেজ করব। এইটা চিন্তা করা সহজ হলেও বাস্তবে ফলো করা খুবই কঠিন। তাই আজকের পর থেকে দিনের ২৪ ঘণ্টা সময় ম্যানেজ করতে যাবি না। এমনকি সারা দিনের মধ্যে ১০ ঘণ্টাও ম্যানেজ করতে যাওয়ার দরকার নাই; বরং ৩ ঘণ্টা ম্যানেজ করা দিয়ে শুরু কর। একটা অ্যানালগ টাইমবক্স সেট করে সেটা ম্যানেজ করতে পারস কি না, দেখ। প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা সময় ইফেক্টিভলি কাজে লাগাতে পারস কি না, দেখ। সেটা একটানা সাত দিন করতে পারলে, তারপর আরও ৩ ঘণ্টা যোগ করলি। একটু একটু করে টাইম ম্যানেজমেন্টের জগতে, ইফেক্টিভ লাইফের জগতে প্রবেশ করলি।

সিরিয়াসলি টাইম ম্যানেজ করার সময় শুধু কোন কোন কাজ করবি, সেই দিকে খেয়াল রাখলে হবে না; বরং কোন কোন কাজ করা যাবে না বা কোন কোন কাজ কম কম করে করবি, সেটাও মাথায় থাকতে হবে। কখন রিলাক্স হবি আর কখন সিরিয়াস হবি, সেটা কন্ট্রোলে রাখতে হবে। একটু একটু করে নিজের ওপর, নিজের মুডের ওপর, নিজের ইমোশনের ওপর কন্ট্রোল করা শুরু না করলে কোনো দিনও টাইম ম্যানেজমেন্টে সফল হতে পারবি না।

এই টাইম ম্যানেজ করা একটা অভ্যাসের বিষয়। একটা প্র্যাকটিসের বিষয়। সেটা প্র্যাকটিস করতে করতে একসময় লাইনে চলে আসবে।

Don't say you don't have enough time. You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pasteur, Michaelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, and Albert Einstein. — H. Jackson Brown Jr.

ফ্রেন্ড ফিল্টার ক্লিনিক

তোর রেজাল্ট কেমন হবে, তোর ফিউচার কেমন হবে, তোর টাইম ম্যানেজমেন্ট কেমন হবে, সেটা তোর আশপাশের ক্লোজ পাঁচজন মানুষকে দেখলেই বোঝা যায়। এখন তুই যদি তোর আশপাশের মানুষগুলো কেমন সেটা চেক করতে চাস, তাহলে পরের পাতার ফ্রেন্ড ফিল্টার ক্লিনিকে চলে যা। সেখানে একটা ফিল্টারের ওপরে পাঁচটা পাথর দেওয়া আছে। এখন তোর কাজ হচ্ছে আশপাশের পাঁচজন মানুষের নাম লেখা। যাদের সঙ্গে তুই সবচেয়ে বেশি কথা বলস। সবচেয়ে বেশি মেলামেশা করস। ওরা তোর ফ্রেন্ড, ফ্যামিলি মেম্বার, কলিগ বা রুমমেট হতে পারে। এই পাঁচটা নাম লেখার পর নামগুলোকে ফিল্টারের মধ্যে ফেলে দে। যদি কোনো একটা নামের মানুষ তোকে পড়ালেখায় বা এনজয় করা কন্ট্রোল করে কিংবা স্কিল ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে, তাহলে সে তোর সঠিক ফ্রেন্ড। আর যদি কোনোটাতেই হেল্প না করে বা খুব বেশি উপভোগের মধ্যে নিয়ে সময় নষ্ট করে, তাহলে সে তোর রিয়েল ফ্রেন্ড না।

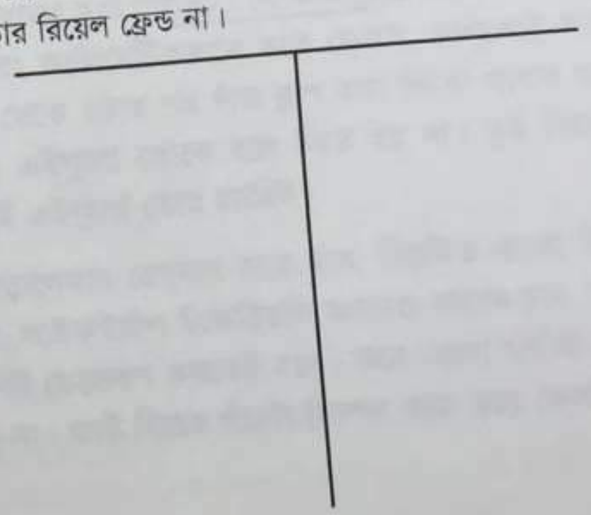

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

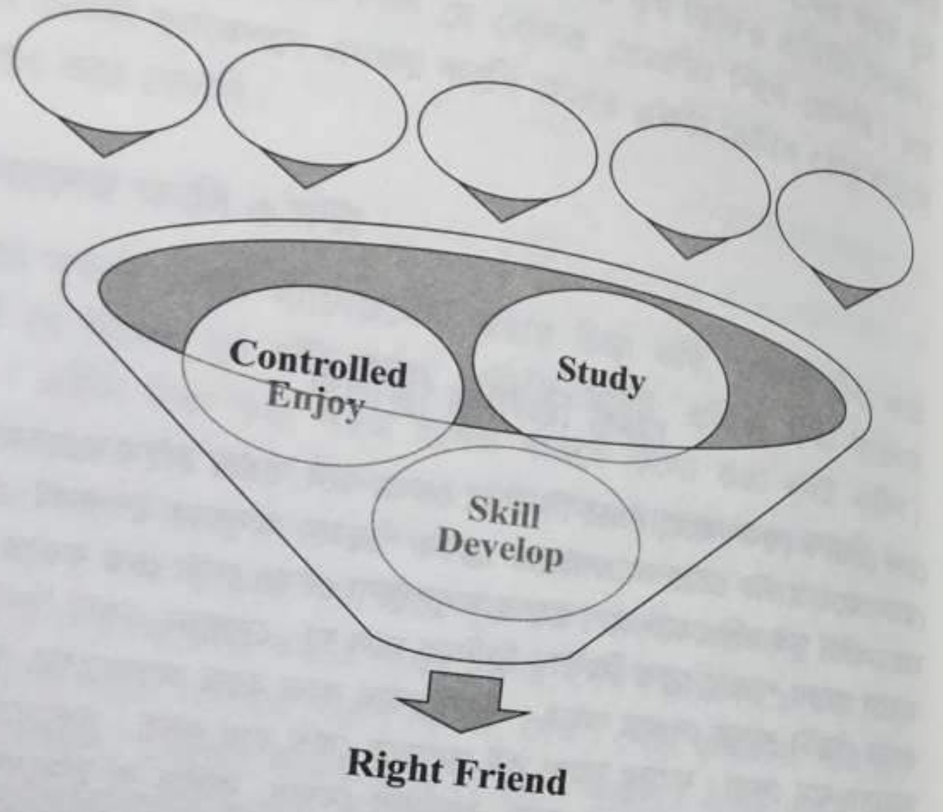

১._____

২._____

৩._____

অল্প অল্প ডিপোজিট, মাস শেষে ভালো হ্যাবিট

মাঝখানে চলে গেল আরও দুই বছর। এর মধ্যে নুয়াজ কিছুদিন চাকরি করেছে। চাকরি করতে করতে GRE পরীক্ষা দিছিল একবার। স্কোর ভালো না হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে ৩ মাস পর আবার GRE দিছে। তারপর অন্য আরেকটা চাকরিতে ঢুকে, চাকরি করতে করতে হায়ার স্টাডির জন্য অ্যাপ্লাই করছে। স্কলারশিপ পাওয়ার দুই মাস পর ভিসা কনফার্ম হইছে। এখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে ডিপার্টমেন্টে আসছে স্যারদের কাছ থেকে বিদায় নিতে। স্যারদের সঙ্গে কথা বলে যখন বের হচ্ছে, তখন ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন ছেলেপুলে তাকে ঘিরে ধরেছে।

তাদের প্রথম কথাই হচ্ছে। ভাইয়া, ট্রিট দেন। সেটা নিয়ে কতক্ষণ আলাপ-সালাপ চলার পর একজন বলে বসছে,

আপনার সম্পর্কে অনেক শুনেছি। আমরা সবাই আপনার মতো হতে চাই। আমরা অনেক কিছু করার আশা করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনোটাই করা হয়ে ওঠে না।

— শুন, আমারও তোদের মতো অবস্থা ছিল। রেজাল্ট ভালো ছিল না। পরে সেকেন্ড ইয়ারে আমাদের এক সিনিয়র ভাই, সোহান ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক সাজেশন নিছি। আমার মতো অনেকেই ওনার কাছ থেকে সাজেশন নিছে। কিন্তু বেশির ভাগ পোলাপানই সেই গাইডলাইনগুলো অ্যাপ্লাই করে নাই। আমি চেষ্টা করেছি এবং সেটা ধরে রাখার চেষ্টা করছি। এই চেষ্টাটা ধরে রাখাই হচ্ছে হ্যাবিট ডেভেলপ করা। তোরা যদি ভালো এবং ইফেক্টিভ হ্যাবিট ডেভেলপ করতে চাস—

হ্যাবিট একধরনের ছুপা স্পিরিট। যে কাজগুলো করার জন্য আলাদা স্পিরিট লাগে না; বরং অটোমেটিকভাবে করে ফেলস, সেগুলোই হ্যাবিট। যেমন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দাঁত ব্রাশ করা কিংবা খাবার খাওয়ার আগে হাত ধোয়া। এইগুলো তোকে বলে দিতে হয় না। তুই নিজে নিজে করে ফেলস। তাই এইগুলো তোর হ্যাবিট।

তুই যদি পড়ালেখায় রেগুলার হতে চাস, নিয়মিত ভালো স্কিল ডেভেলপ করতে চাস, লাইফস্টাইল ইফেক্টিভলি ম্যানেজ করতে চাস, তাহলে তোকে ভালো হ্যাবিট ডেভেলপ করতেই হবে। তবে ভালো হ্যাবিট ডেভেলপ করা কঠিন কিছু না। জাস্ট নিচের পাঁচটা সিম্পল কাজ করে ফেলবি—

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

সংকল্প দাশন (Be Determined)

নিজের ভেতর থেকে ১০০ ভাগ কমিটমেন্ট না থাকলে, কোনো দিনও ভালো হ্যাবিট ডেভেলপ করা সম্ভব না। তাই নিজেই নিজেকে বলতে হবে, আমি এইটা করবই করব। দুনিয়া উল্টে যাক। এইটা আমি করেই ছাড়ব। এই লেভেলের কমিটমেন্ট থাকলে যেকোনো নতুন হ্যাবিট ডেভেলপ করে সেটা ধরে রাখা অসম্ভব।

সুধা দাশন (Set a Reward)

যে হ্যাবিট ডেভেলপ করতে চাস, সেটার মধ্যে মজা খুঁজে বের করতে হবে। ছোট ছোট রিওয়ার্ড সেট করতে হবে। কারণ মজা পেলে, সুধা পেলে, সেটা ছাড়তে কেউ পারে না; বরং বারবার করতে ইচ্ছে করবে। যেমন ধর তুই সকালে ঘুম থেকে উঠে ২ ঘণ্টা মোবাইল টিপাটিপি করস। তুই চিন্তা করতেছস এইটা ছেড়ে দিয়ে এই ২ ঘণ্টা পড়ালেখা করা উচিত। তাই তুই একটা রিওয়ার্ড সিস্টেম চালু করছস। যদি ঘুম থেকে ওঠার পর ২ ঘণ্টা মোবাইল না ধরে থাকতে পারস, তাহলে তুই ডিমভাজি দিয়ে পরোটা খাবি। আর যদি কোনো কারণে মোবাইল ধরে ফেলস, তাহলে তুই শুধু পানির মধ্যে চুবিয়ে চুবিয়ে পাউরুটি খাবি। এই যে করতে পারলে রিওয়ার্ড আর না করতে পারলে শাস্তি—এইটাই তোর ভালো হ্যাবিট ডেভেলপ করার মোটিভেশন হিসেবে কাজ করবে।

স্বল্প দাশন (Take Small Steps)

কখনোই হ্যাবিট ডেভেলপ করার জন্য কোনো একটা কাজ টানা এক মাস বা তিন মাস করার সিদ্ধান্ত নিবি না। সেটা কোনো দিনও এক টানা এত দিন করে যেতে পারবি না; বরং তুই টার্গেট নিবি টানা চার দিন করতে। প্রথমবার টানা চার দিন করার পর চিন্তা করবি—আরে চার দিনে তো পারলাম, তাইলে পরের তিন দিন আবার টানা করে দেখি। এভাবে চার দিন আর তিন দিন শেষ হওয়ার পর চিন্তা করবি। আগে তো একবার টানা চার দিন করতে পারছি, এখন আবার আরেকটা টানা চার দিন করার টার্গেট নেই। এই চারদিন করতে পারলে আগের মতো টানা তিন দিন করার টার্গেট নিবি। এভাবে কিছুদিন কন্টিনিউ করতে করতে একসময় হ্যাবিট ডেভেলপ হয়ে যাবে।

সঙ্গী দাশন (Find a Partner)

হ্যাবিট ডেভেলপ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে সঙ্গী দাশন। তুই যে হ্যাবিট ডেভেলপ করতে চাস, সে রকম আরেকজন খুঁজে বের করবি। তার সঙ্গে ডিসকাস করবি। সে কীভাবে কী করতেছে, সেটা শুনবি। নিজে কী করতেছস, সেটা তার সঙ্গে শেয়ার করবি। তাহলে দুজনের আলোচনা করতে করতে দেখবি কিছুদিনের মধ্যে হ্যাবিট ডেভেলপ হয়ে গেছে। এ জন্যই পাঁচজন সিগারেটখোরের সঙ্গে থাকলে তুইও সিগারেটখোর হয়ে যাবি। আবার পাঁচজন ভালো স্টুডেন্টের সঙ্গে থাকলে তোর রেজাল্টও ভালো হতে থাকবে।

সাধনা দাশন (Keep Doing It)

হ্যাবিট ডেভেলপ করতে হলে তোকে কাজটা ডেইলি করতে হবে। তাই তুই যদি গিটার বাজানো শিখতে চাস, তাহলে ঠিক করে নে ডেইলি তুই একটা করে কর্ড ধরবি এবং মিনিমাম পাঁচ মিনিট হলেও জ্যাম করবি। কাজটা হবে ছোট কিন্তু সেটা প্রতিদিন করতে হবে।

বড় হ্যাবিট ডেভেলপ করতে যদি সাহস না পাস, তাহলে ছোট ছোট করে শুরু করবি। নিজেই নিজেকে বলবি, আমি হ্যাবিট ডেভেলপ করব না। জাস্ট এই কাজটা করব বা ওইটুকু সময় দেব। তাহলে হ্যাবিট ডেভেলপ করার আগে মাইক্রো হ্যাবিট ডেভেলপ করার চেষ্টা করলি। তাহলেই সেটা ধীরে ধীরে একসময় বড় এবং ইফেক্টিভ হ্যাবিট হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে।

মনে রাখবি, হ্যাবিট ডেভেলপ করা একটা মিশন। এই মিশনে কোনো কম্প্রোমাইজ করা যাবে না। মাঝেমধ্যে ফ্রেন্ডরা দ্রুত বাসা থেকে বের হওয়ার তাড়া দেবে। কোথাও ঘুরতে গেলে সবাই রেডি হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে তুই তোর হ্যাবিটের ডেইলি কাজটা করে ফেললি। একটু ওলট-পালট হলেও যে হ্যাবিটের কাজটা করতে পারে। সে-ই হ্যাবিট ডেভেলপ করতে পারে। বাকিরা—হচ্ছে না, হবে না, পারতেছি না বলে কান্নাকাটি করবে।

Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. — Jim Rohn

If your habits don't line up with your dream, then you need to either change your habits or change your dream. — John Maxwell

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

প্রোকাস্টিনেশনকে ফ্রাই করে, ডেস্টিনেশনের সার্কিট

ভাইয়া, হ্যাবিট ডেভেলপ করতে যাই আর পড়ালেখা করতে যাই, সময়মতো করে উঠতে পারি না। খালি প্রোকাস্টিনেশন আর প্রোকাস্টিনেশন।

তখন নুয়াজ একটু হেসে বলল। দেখবি কেউ কেউ প্রেমের প্রপোজ করার ক্ষেত্রেও প্রোকাস্টিনেশন করে। কয়দিন পরে দেখবি—

প্রপোজ করব কি করব না—এ রকম টালবাহানা করতে করতে শাহানা, মোহনা; তোর না হয়ে, রানার সঙ্গে ডানা মেলে, তোর ফিলিংসকে ত্যানা ত্যানা করে ফেলছে।

এই টালবাহানা আর ঢিলামি-পিছলামির চক্করে প্রেম, পরীক্ষার প্রিপারেশন, প্রোগ্রামিং শেখা, ইংরেজি ভালো করে জানা, বিজনেস কম্পিটিশনে নাম দেওয়া, ক্যাম্পাসের লিডার হওয়া, সব কয়টাই শুরু করি করি বলবি, কিন্তু কোনোটাই শুরু করা হয়ে উঠবে না। যেই লাউ, সেই কাউ হয়ে বসে থাকবি।

এই প্রোকাস্টিনেশনের খপ্পর থেকে মুক্তি পাওয়া কিন্তু খুবই সোজা। জাস্ট কয়েকটা সিম্পল ট্রিকস অ্যাপ্লাই করবি।

ইনস্ট্যান্ট পুঁচকা ট্রিকস

যখনই মনে হবে আজকে থাক। তখনই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠবি—আজকে জাস্ট পাঁচ মিনিট করব। বাকিটা না হয় কালকে। যখনই ঢিলামি, পিছলামির কথা মনে আসবে, তখন পাঁচ মিনিটের চ্যালেঞ্জ ছাড়বি। পাঁচ মিনিট তো এমন বেশি কিছু না। জাস্ট পাঁচ মিনিটই তো। এর জন্য তো খেলা শেষ হয়ে যাবে না, বার্থডে পার্টি মিস হয়ে যাবে না।

খুচরা ভাঙারি ট্রিকস

আমাদের বড় রিপোর্ট লেখা, বিশাল প্রেজেন্টেশনের স্লাইড বানানো, মোটা বই পড়তে শুরু করা হয় না। কারণ কাজটা অনেক বড়। করতে অনেক সময় লেগে যাবে। হয়তো ১২০ পাতার রিপোর্ট লিখতে হবে। সেটা চিন্তা করবি না; বরং চিন্তা করবি আজকে জাস্ট দুই পাতা লিখব। একইভাবে পুরা বই পড়ার টার্গেট যেহেতু এক দিনে শেষ হবে না, তাই আজকের টার্গেট জাস্ট দশ পাতা পড়া। এভাবে টার্গেট যত ছোট হবে, সেটা ফিনিশ করা তত সহজ হবে।

শর্ট ডেডলাইন ট্রিকস

আমরা পরীক্ষার আগের রাত্রে জানপ্রাণ দিয়ে পড়ি। এক মাস আগে ঠিকই জানতাম অমুক দিন পরীক্ষা, কিন্তু তখন সময় থাকলেও দশ ভাগের এক ভাগ সিরিয়াসনেস থাকে না। কারণ তখন ডেডলাইনের প্রেসার নাই। তাই আজকের পর থেকে দুই মাস পরের রিপোর্ট সাবমিট করার ডেডলাইন বলবি না; বরং বলবি এই বুধবারে ইন্ট্রোডাকশন আর প্রথম চ্যাপ্টার লেখার ডেডলাইন। ভালো হোক বা খারাপ হোক এইটা বুধবারের মধ্যে শেষ করতে হবে। একইভাবে চার মাস পরে পরীক্ষা না; বরং এই শুক্রবার ফিজিকস প্রথম পত্রের পরীক্ষা। দরকার হলে আমি নিজে নিজে বাসায় বসে বসে তিন ঘন্টার পরীক্ষা দিয়ে দেব। পারলে ঠেকা।

ডিসিশন নিয়ে ফেলার ট্রিকস

বেশির ভাগ সময় এইভাবে করব না ওইভাবে করব, স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড এটা হবে না অন্যটা হবে—এ রকম ইনডিসিশনের জন্য মেইন যে কাজ করা উচিত, সেটাই শুরু করা হয় না। তাই কখনো এই কনফিউশন নিয়ে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নষ্ট করবি না। দরকার হলে কয়েন টস করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবি। পরে স্যারকে দেখিয়ে, বন্ধুদের ফিডব্যাক নিয়ে, সেটা চেইঞ্জ করার প্রয়োজন হলে চেইঞ্জ করে ফেলবি।

ওভার কনফিডেন্সের ডেমো ট্রিকস

মাঝেমধ্যে আমাদের ভেতরে ওভার কনফিডেন্সের ভূত চলে আসে। ভাইবার ডেট ফিক্সড হইছে, বিসিএসের প্রজ্ঞাপন আসছে? আরে দূর!! এখন থাক। সামনের মাসে কোপায়ে সব শেষ করে ফেলব। এ রকম ওভার কনফিডেন্স যখন মনে আসবে, তখনই নিজে নিজেকে বলবি, দুই মাস পরে যে ফাটিয়ে ফেলতে পারবি, সেটা আজকে ছোট একটা অংশ করে ফাটিয়ে দেওয়ার সামর্থ্যের ডেমো দেখা। এই নে তিন বছর আগের প্রশ্ন। এইটা দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ দে যে তুই পারবি। এইভাবে একটু একটু করে প্রোকাস্টিনেশনের সঙ্গে ট্রিকস খেললে ডেস্টিনেশনে পৌছা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

হায়ার স্টাডির ভিটামিন, পার্ট নেওয়ার প্রোটিন

আরেকজন জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ভাইয়া, আপনি তো স্কলারশিপ পেয়েছেন। আমরা যদি হায়ার স্টাডি করতে বিদেশ যেতে চাই, আমাদের এখন থেকে কী কী করা উচিত।

অনার্স শেষ করে দেশের বাইরে মাস্টার্স করতে চাস? হায়ার স্টাডি করতে চাস? এখন তেমন কিছু করার দরকার নাই, জাস্ট চারটা সিম্পল কাজ করবি।

১. আন্ডারগ্রেডে জিপিএ যত ভালো রাখা সম্ভব, তত ভালো রাখার চেষ্টা করবি। ৩.৭৫-এর ওপরে হলে ভালো। ক্লাসে টপ হইলে আরও ভালো। কারণ হায়ার স্টাডি বা স্কলারশিপের জন্য ফার্স্ট যে জিনিসটা দেখে সেটা হচ্ছে, জিপিএ। জিপিএ বাড়ানোর অপশন থাকলে, সেটার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবি। তবে জিপিএ ৩.০০-এর কম হলেও সেটা রিসার্চ, GRE বা TOEFL-এর স্কোর, Statement of Purpose (SOP) দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া যায়।

২. শুরু থেকেই ইংরেজিটা ভালো করে শেখার চেষ্টা করবি। ক্লাসের পড়ার গ্যাপেগুপে ইংরেজি শিখবি। কারণ GRE-এর ব্যাপারটা আসলে ওয়ার্ড মুখস্থ করার ওপরে বেশি ডিপেন্ড করে না; বরং ডিপেন্ড করে কনটেক্সট থেকে মিনিং বোঝার ওপরে।

৩. চোখ-কান খোলা রাখবি কোনো ভাইয়া, আপু বা ফ্যাকাল্টি বিদেশ যাচ্ছেন। চান্স পেলে তাদের সঙ্গে দেখা করবি। তারা কীভাবে কী করছে। কত দিন লাগছে। ওভারঅল প্রসেস কেমন ছিল। একটু আইডিয়া নিয়ে রাখবি। চতুর্থ বর্ষে উঠে পাসপোর্ট করিয়ে ফেলবি।

৪. স্টুডেন্ট লাইফে যত টাকা কামাই করবি তার ২০ শতাংশ সেইভ করে রাখবি। কারণ হায়ার স্টাডি করতে যেতে অনেক খরচ হবে। বিভিন্ন পরীক্ষা দেওয়ার ফি, অ্যাডমিশন, ফরম জমা দেওয়ার ফি, ভিসার ফি, পাসপোর্ট, ভিসা অ্যাপ্লিকেশন, বিমানের টিকিট, এমন করতে করতে দুই-তিন লাখ টাকা লেগে যাবে।

পাস করার পর তিনটা কাজ করতে হবে—

১. তোর প্রায়োরিটি

পাস করার পর আমাদের তিন ধরনের প্রায়োরিটি হতে পারে। এক. দ্রুত চাকরিতে ঢুকে ফ্যামিলিকে ফাইনান্সিয়াল সাপোর্ট করতে হবে। দুই. দ্রুত চাকরিতে ঢুকে নিজেকে এস্টাবলিস্ট প্রমাণ করে প্রিয়জনের অন্যের সঙ্গে বিয়ে ঠেকিয়ে হানিমুন অ্যারেঞ্জ করতে হবে। তিন. চাকরি বা বিয়ে নিয়ে তাড়া নাই। ধীরেসুস্থে হায়ার স্টাডি করতে যাওয়ার কাজ শুরু করতে হবে। নিজের সিচুয়েশনটা বুঝে সেই অনুসারে সামনে এগোনোর ডিসিশন নিবি।

২. কোন দেশে যাবি?

তুই চিন্তা করে দেখ তোর সাবজেক্টের কে কে দেশের বাইরে হায়ার স্টাডি করতে গেছে। তারা কোন কোন ভার্সিটিতে গেছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ কর। আর কাউকে খুঁজে না পাইলে, গুগল মামাকে জিজ্ঞেস কর। ধর তুই যদি MBA করতে চাস, তাহলে দেশের নাম ধরে ধরে সার্চ দিবি। যেমন MBA in USA কিংবা MBA scholarship in Canada অথবা Civil Engineering in China তারপর সিরিয়াল ধরে ভার্সিটির ওয়েবসাইটে যাবি। ঘাঁটাঘাঁটি করবি। আপাতত গুগলের ওপরে ওষুধ নাই।

৩. অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্ট লিস্ট

এইভাবে কয়েক দিন রিসার্চ করে কোন কোন দেশে যাওয়া যাবে, কোন কোন ভার্সিটিতে যাওয়া যাবে এমন ৩০-৪০টা ভার্সিটি ঠিক করে তাদের কী কী রিকোয়ারমেন্ট আছে, সেগুলো একটা Excel ফাইলে রাখবি। সেখানে প্রফেসরদের ই-মেইল, তাদের এরিয়া অব ইন্টারেস্ট লিখে রাখবি। তারপর সময় করে করে তাদের একটা-দুইটা করে ই-মেইল দিবি। প্রফেসরদের কী লিখতে হয়, সেটা গুগলে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবি।

৪. GRE প্রিপারেশন

যদি কোনো কারণে চাকরিতে জয়েন করা লাগে তাহলে চাকরির পাশাপাশি GRE পড়তে থাক। ডেইলি তিন-চার ঘণ্টা করে পড়বি। বিভিন্ন টেকনিক

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

ইউটিউব ভিডিও দেখে দেখে বের করবি। প্রশ্নের প্যাটার্ন দেখ। টেকনিকগুলো খুঁজে বের কর। এক মাস চেষ্টা করলেই ম্যাথে ভালো করতে পারবি। আর GRE না ছুঁয়ে ভয় পেয়ে অন্য দেশে পালিয়ে যাবি না।

৫. সেট ইউর টাইম লাইন

হায়ার স্টাডি করতে যাওয়া দেড় থেকে দুই বছরের একটা প্রসেস। কখনো অ্যাডমিশন ডেডলাইনের দেড় মাস আগে GRE বা TOEFL দেওয়ার ডেডলাইন সেট করবি না; বরং ৪ থেকে ৬ মাস আগে পরীক্ষা দেওয়ার রেজিস্ট্রেশন করবি। তাহলে কোনো কারণে প্রথমবার পরীক্ষায় খারাপ করলে আরেকবার প্রিপারেশন নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে দিতে পারবি।

বি ফোকাসড

বিভিন্নজন বিভিন্ন কথা বলবে। যেমন তোর সিজি ৩.০০-এর কম হলে তোর হবে না। এখন ভিসা দেবে না। আগের মতো সহজ নাই। অমুকের হয় নাই, তোর ক্যামনে হবে? GRE সেকেন্ড টাইম দিলে ফান্ড দেবে না। এমন সব কথা কানে ঢোকাতে যাবি না; বরং তোর যেটা যেটা করা দরকার, সেগুলো সিরিয়াল ওয়াইজ করতে থাকবি।

হায়ার স্টাডির ব্যাপারে সিরিয়াস হয়ে থাকলে তিন-চার মাসের পকেট খরচ জোগাড় করে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে দিনরাত প্রিপারেশন নিতে শুরু করে দিবি। আর দেশের বাইরে সেটেল হওয়ার ইচ্ছা থাকলে আইবিএ, বিসিএস, লাইনে গুঁতাগুঁতি না করে সোজা লাইনটা ধরবি।

ইগনোর আন্টিজ

চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাসায় বসে বসে হায়ার স্টাডির প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করলে প্রথম প্রথম আন্টিরা বিভিন্ন জিনিস বলবে। পরে যখন শুনবে তুই স্কলারশিপ পেয়ে গেছস তখন বলবে, আমি আগেই জানতাম।

নো কম্প্রোমাইজ

ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড সাবজেক্টে ফান্ড তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে ফার্মেসি, ফিজিকস, এমবিএ, ইকোনমিকস, পরিসংখ্যান, এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচার, টেক্সটাইলের পোলাপান গুঁতায়গাঁতায় ঠিকই ফান্ড বের করে ফেলে। জিপিএ, জিআরই, পাবলিকেশন মেটার করে। পাবলিকেশন থাকলে বাড়তি সুবিধা। তবে পাবলিকেশন থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নাই। তা ছাড়া প্রাইভেট না পাবলিক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট, সেটা মেটার করে না। কারও ইয়ার গ্যাপ হলে সেটা নিয়ে চিন্তা করে না। তোর প্রোফাইলের কম্বিনেশন ভালো হলে অ্যাডমিশন দেবে, ফান্ড দেবে।

তাই নো কম্প্রোমাইজ স্টাইলে আগাইতে থাক। যদি তিনবার চেষ্টা করার পরেও না হয়, তখন কম্প্রোমাইজ করার চিন্তা করবি, তার আগে না।

বি প্র্যাকটিক্যাল

সবাই Harvard, MIT, Oxford-এ পড়বে না। সো, তোর প্রোফাইল অনুসারে সেই মাপের ভার্সিটি টার্গেট করবি। আর খুব বেশি খায়েশ হলে টপ একটা, মিডিয়াম চারটা আর কম ভালো একটা ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করে দিবি। যাতে অন্তত একটা ভার্সিটি লেগে যায়।

সময়মতো টেনশন

টোফেল, GRE দিয়ে, SOP লিখে, ভার্সিটি সিলেক্ট করে, প্রফেসরদের ই-মেইল করে, মিনিমাম ৪টা ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করে তারপর আরামসে রিপ্লাই পাওয়ার জন্য টেনশন করবি। তার আগে টেনশন করতে যাবি না। আবার আই-২০ পাওয়ার পর, ভিসার জন্য অ্যাম্বাসিতে অ্যাপ্লাই করে আরেকবার টেনশন করতে বসবি।

মনে রাখবি, অন্যের জন্য যেই সিস্টেমে কাজ হইছে বা কাজ হয়নি, সেটা তোর জন্য ১০০ ভাগ সেইম হবে না। কারণ একেক জায়গায় একেক সিস্টেমে হবে। একেক প্রফেসর একেক স্টাইলে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট সিলেক্ট করে। তাই শেষ পর্যন্ত লেগে থাকলে না হয়ে আর উপায় থাকবে না।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

৭. ফোকাস অন পজিটিভিটি

ঝামেলা ছাড়া লাইফ নাই। লিমিটেশন ছাড়া মানুষ নাই। তাই সবারই লাইফে কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থাকবে। যেমন কারও উচ্চতা কম, কারও গায়ের বর্ণ কম উজ্জ্বল, কারও উচ্চারণে গ্রাম্য টান, কারও আবার তোতলামির সমস্যা, ফ্যামিলি গ্যাঞ্জাম। এই রকম বিভিন্ন ঝামেলা নিয়েই আমাদের লাইফ। তাই এই সব সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিতে হবে। সবার সামনে সহজ ভাষায় এই সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলতে হবে। কেউ টিটকারী মারতে আসলে রাগ না করে তুই তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই নিজেকে ওর সামনে ফান করা শুরু করবি। তাহলে টিটকারী মারতে আসা পাবলিকটা তোকে খ্যাপাতে না পেরে, টিটকারী মারা বন্ধ করে দেবে।

তারপর এই সব লিমিটেশনের পাশাপাশি তোর কী কী স্ট্রেংথ আছে, সেগুলোতে ফোকাস কর। সেগুলো দিয়ে সামনে এগোতে থাক।

লাইফের ভোল্টেজ আপ-ডাউন করবেই। তার মধ্যেই আমাদের জীবন স্রোতের মতো সামনে এগোতে থাকবে। কখনো জোরে চলবে, আবার কখনো আস্তে আস্তে চলবে। তারপরও এগিয়ে যাবে। এই এগিয়ে যাওয়ার নামই জীবন।

শেষ কথাগুলো বলতে বলতে আরও কয়েকবার চোখাচোখি হলো। যতবারই চোখাচোখি হয়েছে, ততবারই তুই আর তুমির মধ্যে গুলিয়ে ফেলছিল নুয়াজ।

লাইফ চেকার ক্লিনিক

এই যে তুই, হ্যাঁ তুই। এত সময় দিয়ে পুরা বইটা পড়ছস। যদি একটা জিনিসও তোর লাইফে কাজে না লাগাস, তাহলে তোর সময় ১০০ ভাগ বৃথা হলো তো হলো, যে ব্যাটা এই বই লিখছে, দুজনের কষ্টই বৃথা গেল। অন্যদের কষ্ট গোল্লায় যাক, তোর কষ্ট তো আর বৃথা যেতে দেওয়া যায় না। তাই পরের পাতায় একটা লাইফ চেকার আছে। যেখানে মোট পাঁচটা অ্যাঙ্গেলে লাইফকে চেক করার কিছু পয়েন্ট দেওয়া আছে। এখন তোর কাজ হচ্ছে প্রতিটা পয়েন্টে দেখা। তারপর ডানপাশের কথাগুলো তোর জন্য সত্যি হয় তাহলে একটা পূর্ণিমার চাঁদ আঁকবি। যদি মোটামুটি হয় তাহলে আধ-খাওয়া চাঁদ আঁকবি। আর যদি একদমই সত্যিই না হয়, তাহলে পুচকা চাঁদ আঁকবি। যদি কোথাও একটা পূর্ণিমার চাঁদ আঁকোস, তাহলে সেই বাক্সের একটা সাইডের ডট ডট দেওয়া দেয়াল, কলম বা পেনসিল দিয়ে টেনে সলিড দেয়াল দিয়ে দিবি। তোর যদি কোনো বাক্সে চারটা পূর্ণিমার চাঁদ হয়, তাহলে তোর লাইফের ওই এরিয়ার চারটা দেয়াল সলিড হয়ে যাবে।

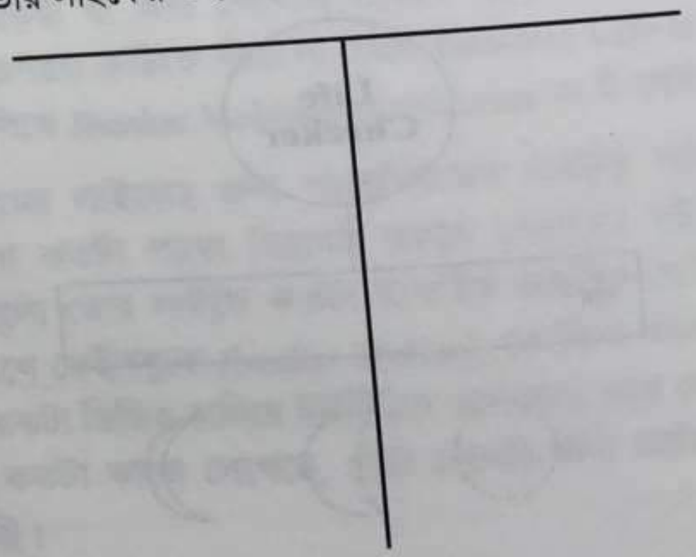

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

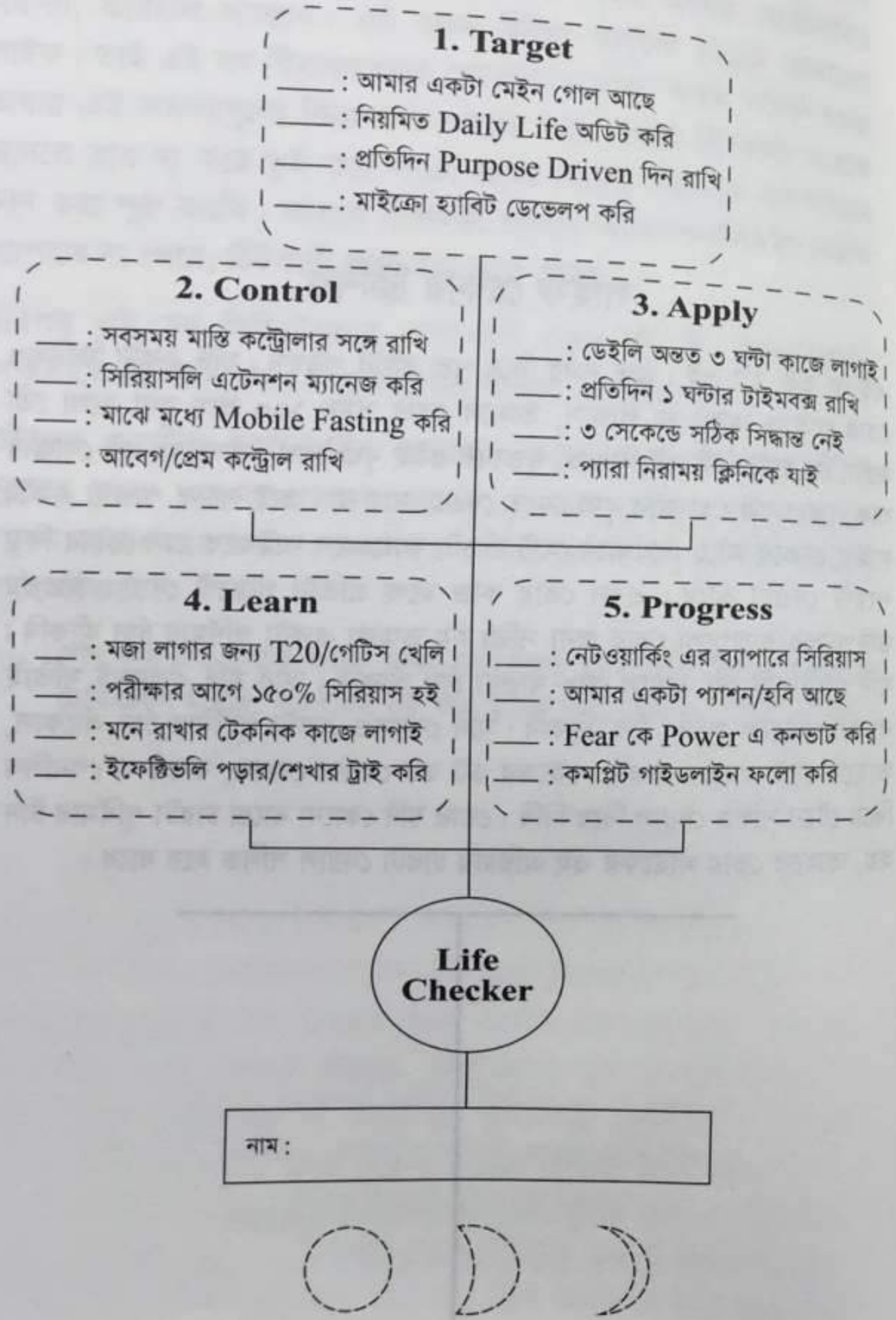

শেষ কথা

এই বইটা শুধু একবার পড়ার জন্য না; বরং লাইফের প্যারা বেড়ে গেলে, কখনো ভোল্টেজের পাওয়ার কমে গেলে, বারবার গিয়ে বইয়ের ভেতরের অংশগুলো পড়ে ফেলবি। যে ১০টি ক্লিনিক দেওয়া আছে, সেগুলোতে চেক করতে চলে যাবি।

তারপর সেই অনুসারে একটু একটু করে নিজেকে লাইনে আনার চেষ্টা করবি। একটু একটু করে ভোল্টেজ বাড়াবি। টার্গেট ঠিক রেখে রেগুলার চেষ্টা চালাতে থাকবি। ইমোশন বা অ্যাটেনশন কন্ট্রোলে রাখবি। লাইফস্টাইল ইফেক্টিভ বানানোর টেকনিক বের করার চেষ্টা করবি। তাহলেই চমৎকার কিছু পাওয়ার দরজা তোর জন্য একটু একটু করে খুলতে শুরু করবে।

তত দিন পর্যন্ত ধৈর্য রাখবি, নিজেই নিজেকে সাহস দিয়ে বলবি—

এই আমি যেহেতু আগে পেরেছি, এই আমি এখনো পারব। অবশ্যই পারব। একটু একটু করে হলেও পারব। ছয় মাস সময় বেশি লাগলেও পারব। আমি পেরে দেখাব। আমি করে দেখাব। অবশ্যই করে দেখাব।

মনে রাখবি, দুনিয়াতে যেকোনো কিছু অর্জন করতে হলে ৩০ শতাংশ হচ্ছে নিজের ওপর ভরসা করে নেমে পড়া। ৬০ শতাংশ হচ্ছে একটা লম্বা সময় ধৈর্য ধরে লেগে থাকা। আর ১০ শতাংশ হচ্ছে লাক বা টাইমিং।

আর কখনো কোনো কারণে গ্যাঞ্জাম বেড়ে গেলে আশপাশের সিনিয়র ভাইয়া-আপু বা কোনো ফ্যাকাল্টির সঙ্গে তোর সিচুয়েশন শেয়ার করবি। সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য কোথাও কাউকে খুঁজে পেলে তার কাছে হেল্প চাইবি। তারপরও কাউকে খুঁজে না পেলে Peramoy Life er Peracitamol সাবজেক্টে লিখে Jhankar.Mahbub@gmail.com এ ই-মেইল করে দিবি।

আর প্যারাময় লাইফের জন্য প্যারাসিটামল কতটুকু কার্যকরী হয়েছে? ক্লিনিকগুলো কতটা প্যারা নিরাময় করতে পেরেছে? বইয়ের টিপস বা টেকনিকগুলো তোর লাইফে কতটা ইফেক্টিভ হয়েছে? সেটা তোর নিজের ভাষায় লিখে ফেইসবুকে Jhankar Mahbub-কে ট্যাগ করে পোস্ট করে দে বা ছোট্ট একটা ভিডিও বানিয়ে ইউটিউবে আপলোড করে দে। তোর লাইফে এই বই কতটা কাজে লেগেছে, সেটা শোনার জন্য আমি আমগাছতলায় বসে আছি।

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

আত্ম-পত্রমিতালি

এখন তুই নিজেই নিজেকে ছোট্ট একটা চিঠি লিখবি। যেই চিঠির বিষয়বস্তু হবে এই প্যারাময় লাইফের প্যারাসিটামল পড়ে তুই তোর লাইফের কোন কোন জিনিসগুলো আজকে থেকে চেইঞ্জ করা শুরু করবি। আজকে থেকে কোন কোন টিপস বা ট্রিকসগুলো অ্যাপ্লাই করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবি। দুই-চারবার, দশবার মিস হয়ে গেলেও কোন কাজগুলি তুই বারবার চেষ্টা করবি। এক মাস পরে তোর নিজের মধ্যে কোন কোন জিনিসগুলো চেইঞ্জ করে ফেলার গ্যারান্টি দিবি। সেগুলা নিয়েই তুই নিজেকেই নিজে একটা চিঠি লিখে ফেল। (দরকার হলে মাঝেমধ্যে এ রকম চিঠি লিখবি।)

তারিখ :

প্রিয় _____,

আমি জানি তুমি কেমন আছ। আমি জানি তোমার লাইফে কী কী প্যারা আছে। আমি জানি তুমি কী কী জানো, তুমি কী কী জিনিস ট্রাই করতে পারো। তোমার কী ভালো লাগে, কী খারাপ লাগে। আবার আমি এ-ও জানি, তোমাকে কীভাবে লাইনে আনতে হয়। কীভাবে ডান্ডা মারতে হয়। তাই আজকে থেকে তোমার লাইফটা লাইনে আনার জন্য তুমি _____

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

আজ এ পর্যন্তই।

ইতি,

তোমার সবচেয়ে প্রিয় _____

ছোট ছোট চেষ্টা, বড় বড় সফলতা...

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

আলোকচিত্র : কারিনা

অর্ধদশক ধরে সিরিয়াসলি লেখালেখি করে নিজেকে অতুলনীয় করে তুলেছেন ঝংকার মাহবুব।

লেখক বুদ্ধি করে বলেন, অতুলনীয়। যাতে অন্য কেউ তুলনা করতে না আসে। সেই একই সুরে ক্লোজআপ-মার্কা হাসি দিয়ে দাবি করেন, তিনি খেলাধুলার ফার্স্ট বয়। পরে এক সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি থেকে জানা যায়, কাজিনদের সাথে কুতকুত খেলায় উনি নিয়মিতই লাস্ট হতেন। তবে কাজিনদের মধ্যে উনি ছাড়া আর কোনো ছেলে না থাকায় টেকনিক্যালি তিনিই ফার্স্ট বয়।

মাঝবেলায় এসে খেলাধুলার ফার্স্ট বয় হওয়ার প্যারা না থাকায় বুয়েটের IPE ডিপার্টমেন্টের ইতিহাসে প্রথম জিপিএ ৪.০০-এর মধ্যে ৪.০০ পান। বুয়েট থেকে পাস করার পর ৩ বছর স্টার্টআপ করে, নর্থ ড্যাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্সও করেন। বর্তমানে স্ত্রী কারিনা ইসলামের চাকরিকে অজুহাত হিসেবে কাজে লাগিয়ে টেক্সাসের ডালাস শহরে বসে শিকাগোর নিলসেন কোম্পানিতে রিমোটলি সিনিয়র ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে কামলা খাটেন।

www.rokomari.com/jhankarmahbub

Poragedu.blogspot.com -Physicskill.blogspot.com

Rokomari.com
প্যারাময় লাইফের
প্যারাসিটামল
ঝংকার মাহবুব
190207
177431#31552[illegible]
227

ADARSHA
Phone: +88-02-9612877, +880-1793296202
Email: info@adarshapublications.com
Web: www.adarshapublications.com